দেখিতে পাইলাম না? এত করুণার আস্বাদ পাইয়া যদি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের হস্ত জানিতে না পারি, তাঁহার সত্যসুন্দর মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিতে না পারি, তবে আর কবে তাহা বুঝিব?

বিপদে সম্পদে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের প্রতি যে অটল নির্ভর রাখিতে হয় এবং আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় যে কোন না কোন মঙ্গলভাব অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য একটী সুন্দর উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কোন দেশের এক সংশয়বাদী রাজা ছিলেন এবং তাঁহার এক ঈশ্বরপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। একদিন রাজা মন্ত্রীকে জি[illegible] করিলেন "মন্ত্রি! তুমি যে বল, [illegible] কিছু প্রে[illegible] করেন, তাহাই [illegible] মঙ্গলের হ[illegible]; আচ্ছা, এই যে [illegible] আমারী প্র[illegible] আসিয়া সময়ে [illegible] দেয়, ইহাও কি [illegible] বলিলেন [illegible] মঙ্গলবিধান; [illegible] ফলাফল যেমন [illegible] সময়ে বুঝিতে পারি না, সেইরূপ [illegible] প্রভৃতি আপাতত আমাদের চক্ষে অমঙ্গ[illegible] বলিয়া বোধ হ[illegible] বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে মঙ্গ[illegible] আছে তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; এবং এ সকলই যে ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল নিয়মের ফল, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে সঙ্কুচিত হইব না।" এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন রাজার অঙ্গুলিতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইল। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার সেই ক্ষত মঙ্গলের জন্য ঘটিল কি না। মন্ত্রী বলিলেন যে "ইহাতে নিশ্চয়ই মঙ্গল নিহিত আছে।" তখন রাজা ভাবিলেন যে তাঁহার অমঙ্গল ঘটিলেও যখন মন্ত্রী বলেন তাহা মঙ্গলেরই জন্য, তখন নিশ্চয়ই মন্ত্রী তাঁহার অমঙ্গল কামনা করেন। এইরূপ ভাবিয়া রাজা মন্ত্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজার জিজ্ঞাসায় মন্ত্রী তখনও বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার এই কারাগারে অবস্থিতিতে ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। রাজার ক্ষত ক্রমে ভাল হইয়া আসিল কিন্তু তাহার চিহ্ন থাকিয়া গেল। এই অবস্থায় রাজা একদিন সঙ্গীদিগকে লইয়া শীকারে বহির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে তিনি সঙ্গহীন হইয়া এক বনের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। তথায় কতকগুলি দস্যু তাঁহাকে রাজা বলিয়া জানিতে না পারিয়া তাহাদের দেবতার নিকট বলি দিবার জন্য বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া চলিল। কিন্তু দেবতার নিকট অক্ষত জীব বলি দেওয়া আবশ্যক, ইহা স্মরণ করিয়া এক [illegible] দস্যু রাজার দেহে কোন প্রকার ক্ষ[illegible] আছে কি না দেখিতে বলিল। [illegible]ন সকলে সেই অঙ্গুলিতে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। রাজা [illegible] যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়া রাজধানী[illegible] করিয়া আসিয়া প্রথমেই মন্ত্রীকে কারাগা[illegible] হইতে মুক্ত করিয়া অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন যে, তাঁহার অঙ্গুলিক্ষতের মধ্যেও প্রকৃতই ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত ছিল, কারণ সেই ক্ষতটুকু না থাকিলেই তাঁহাকে দস্যুহস্তে নিহত হইতে হইত। মন্ত্রীও রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কারাগারে অবস্থিতিতে ঈশ্বরেরই করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ তাঁহার দেহে কোন প্রকার ক্ষত ছিল না, এ অবস্থায় তিনি রাজার সঙ্গে শীকারে থাকিলে নিশ্চয়ই দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতেন।

পূর্ব্বতন ঋষিরা অতি স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন যে ঈশ্বরের করুণা আমাদের রক্ষাকবচ স্বরূপে সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে এবং সেই করুণাসূত্রে এই সমুদায় লোক লোকান্তর গ্রথিত হইয়া আছে; তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ একপদও নিক্ষেপ করিতে পারে না। আমরাও আজ তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সহিত একস্বরে বলিতেছি—

"যএষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥"

যখন তাবৎপ্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই পূর্ণ পুরুষ, তাঁহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা পায়, এত বড় স্পর্দ্ধা কাহার? "তদু নাত্যেতি ক[illegible] কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে [illegible] না। এই যে চরাচর লোক সকল [illegible] ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে প[illegible] করিয়া আমাদিগকে আনন্দ [illegible]রে, ইহাদের মধ্যে একটী বালুকণা [illegible]মিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। [illegible]কটী বালুকণাও যদি নিয়মের অ[illegible]ত হইয়া আস্তে আস্তে কোথাও সরিয়া পড়ে, তবে দেখিতে দেখিতে এই শোভনদৃশ্য সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অণুরাশিতে পরিণত হইবে। এমন সকল আশ্চর্য্য নিয়মে প্রেমসূত্রে যিনি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকলকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহার আছে?

এই পূর্ণ পুরুষ, জাগ্রত দেবতা যখন আমাদের প্রাণের প্রাণরূপে বিরাজমান, তখন দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি শত সহস্র বিভীষিকা আসিলেও আমাদের কিসের ভয়? আমরা যদি বন্ধু বান্ধবের নিকট অপ্রেম লাভ করি, যদি আত্মীয় স্বজনের নিকট অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, তাহাতেই বা কি, যখন সেই মঙ্গলবিধাতা আমাদের নিত্য সখারূপে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত কাল রহিয়াছেন? আমরা যদি পবিত্র থাকি, আমাদের হৃদয় যদি নির্দ্দোষ এবং আত্মা নির্ম্মল থাকে, তবে আমরা মৃত্যুকেও অমৃত বোধে আলিঙ্গন করিতে পারিব।

হে করুণানিধা[illegible]! তুমি আমাদিগকে এই শুভবুদ্ধি দা[illegible] যাহাতে আম[illegible]বিত্র থাকিয়া, [illegible] সমর্পণ করি[illegible] চিরদিন তো[illegible] অন্তকালে [illegible] পারি। আজিকার [illegible] প্রাতঃ সূর্য্যের সঙ্গে [illegible] [illegible]রণ করিয়া [illegible] জীবনের শেষ দিনেও যেন তোমারই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া তোমারই ক্রোড়ের সুশীতল আশ্রয় লাভ করি।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

যা প্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
তামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু।

হে ঈশ্বর, অবিবেকী মনুষ্যদিগের বিষয়ে যে অনপায়িনী প্রীতি তোমার

চিন্তাপর আমার হৃদয় হইতে সেই প্রীতি যেন না যায়। বস্তুত মলিন বিষয়ের প্রতি মনুষ্যের প্রীতি কি অবিনাশী। আমার স্ত্রী আমার পুত্র আমার যশ আমার ঐশ্বর্য্য এই লইয়াই সকলে যেন উন্মত্ত। যে মৃত্যু নিমেষের মধ্যেই এই সমস্ত হইতে তোমায় বঞ্চিত করিবে তাহা আসন্ন তথাচ তুমি এই মলিন বিষয়প্রীতি পরিত্যাগ করিতে চাও না। তাই কোন সাধক কহিয়াছেন, বিষয়ীদিগের বিষয়প্রীতি যেমন অনপায়িনী, হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি আমার প্রীতি যেন সেইরূপই হয়। বস্তুত জ্ঞানালোকে যদি ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে প্রীতিরূপ তৈলে তাহা উজ্জ্বল কর। প্রীতি ব্যতীত কেবল শুষ্ক জ্ঞানে ঈশ্বরকে পাওয়া বড় কঠিন। তুমি যে আজ স্ত্রীপুত্র লইয়া এত উন্মত্ত, বল দেখি প্রীতি ব্যতীত ইহারাই কি তোমার আপনার হইত? একবার প্রীতির বন্ধন কাটিয়া দেও ইহারা কে কোথায় যাইবে। এই সংসারের মূলে কেবল এক প্রেম আছে। তাহারই প্রভাবে লোকে কখন হাসিতেছে কখন বা কাঁদিতেছে। একজন বৈষ্ণব কবি কহিয়াছেন

"প্রাণ ছাড় তো প্রেম ছেড় না,
প্রেমের গাছে সে ফল ফলে।
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন,
ধরা পড়েন প্রেমের কলে।"

ফলত ঈশ্বরপ্রীতি সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ ও সার। তৎপশ্চাৎ জীবে দয়া। এই দয়ার প্রভাব যার পর নাই অসীম। যখন এই ভারতবর্ষে যজ্ঞদেবতার উদ্দেশে নিষ্ঠুর পশুহত্যা প্রচররূপ হইয়া উঠে, ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গলের নিক্রয় একমাত্র পশুরক্তে নির্ণীত হইয়াছিল সেই ঘোর অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে 'সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং' এক মহাপুরুষ উত্থিত হইয়াছিলেন। অহিংসা—জীবে দয়াই যাঁর ধর্ম্মসংস্কারের নিয়ামক। এই দয়া হইতেই প্রাচীন ভারতে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ইহাই এক নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করে। তাই বলিলাম দয়ার প্রভাব যার পর নাই অসীম। আবার যিনি ভক্তিরসের মহাবন্যায় জাতিকুল ভাসাইয়া দিয়া এক নূতনতর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন সেই চৈতন্যদেবকে তাঁহার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, গুরো, ধর্ম্মের সার কি, ইহা এক কথায় আমায় বুঝাইয়া দিন। চৈতন্যদেব কহিলেন, জীবে দয়া। আমরাও সমস্ত হৃদয়ের সহিত মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি ধর্ম্মের সার একমাত্র জীবে দয়া। কিন্তু এই সার্ব্বজনীন দয়া কিরূপে সাধিত হইতে পারে। আমরা তো কেবল স্বার্থ লইয়াই উন্মত্ত, পরার্থকে স্বার্থ করা যে সার্ব্বভৌম মহাব্রত তাহা ভ্রমেও বুঝি না। যে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রত্যেকে বদ্ধ হইয়া আছি, যে সকল কোমল স্নেহবন্ধনে নিরন্তর নিগড়িত হইয়া আছি, আমাদের দয়া তাহা অতিক্রম করিয়া বড় একটা প্রসর লাভ করিতে পারে না। ফলত আমাদের অবস্থা এইরূপই শোচনীয়। কিন্তু যাঁহারা মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সমস্ত পরম কারুণিক ঋষিরা এই সার্ব্বজনীন দয়ার নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির উদ্দেশে কহিয়াছেন

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।"

যিনি পরমাত্মাতেই সকল জীবকে এবং সকল জীবে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, ইহার ফলে তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। অর্থাৎ সকল ভূতে একমাত্র ঈশ্বরকে দেখিয়া

সকলকেই দয়া করেন। যিনি অরূপ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় তাঁহাকে নির্ম্মল জ্ঞান-চক্ষে দেখাই প্রকৃত দর্শন। যিনি আমাতে আছেন তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবে, জ্ঞানে ব্রহ্মের এইরূপ ব্যাপক সত্তা অনুভব করাই ব্রহ্মদর্শন। এইরূপ দর্শনের ফল সর্ব্বজীবে দয়া। ফলত যিনি আমার "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ" একমাত্র তিনিই তো সকলের অন্তরে। তখন তাঁহার অধিষ্ঠান বলিয়া সকলকেই আমি প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিতে যাই, আর কেহই আমার দ্বেষ্য বা ত্যজ্য থাকে না।

এক সময়ে আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণ ব্রহ্মের এই জীবন্ত বিশ্বব্যাপী সত্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এখন যদিও সেই জ্বলন্ত ব্রহ্মজ্ঞান একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রভাব এখনও জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। তাই এদেশের লোকে দয়াকে পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকে। এই দয়ার গভীরতা ও প্রসার আজও কতদূর আছে একবার বিচার করিয়া দেখ। কঙ্কালাবশিষ্ট দীনদৃষ্টি মনুষ্যকে দেখিলে আর এক জনের মনে সহসা দয়ার উদ্রেক হওয়া বড় বিচিত্র নহে। কিন্তু যাহারা এই পৃথিবীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কোন্ অলক্ষিত লোকে আছে কিছুই জানা যায় না, যাহাদের বাস্ত ও বংশের নামমাত্রও নাই সেই সকল অপ্রত্যক্ষ লোককে এবং যাহাদের ভাষা নাই, ক্ষুৎপিপাসার আবেগ বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারে না, যাহারা নিয়ত কেবল লোকের পদতলে দলিত হইতেই জন্মিয়াছে সেই সকল মূক পশুপক্ষী কীটপতঙ্গকে কে দয়া করিয়া থাকে? ফলত যিনি একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বরকে চেতন অচেতন সমস্ত জগতে জ্ঞান প্রাণ শক্তিরূপে দেখিয়াছেন সেই মহাত্মারই বিশাল হৃদয় এই লোকোত্তর দয়ার একমাত্র আধার। এই সমস্ত নিঃসম্পর্ক বহুকালের অপ্রত্যক্ষ লোক এবং নির্ব্বাক মূকেরা তাঁরই হৃদয়ে স্থান পায়। তাই এদেশের জ্ঞানীরা সম্যক বুঝিয়া এবং অজ্ঞানেরা না বুঝিয়া নিত্য শ্রাদ্ধতর্পণে বলিয়া থাকে "যে জাতা বাপ্যজাতা বা" যাহারা আমার কুলে জন্মিয়া থাকুক বা নাই থাকুক, "যেষাং ন মাতা ন পিতা" যাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, "ন বন্ধুঃ" বন্ধু নাই "নৈবান্নসিদ্ধিঃ" আহারের কোনই উপায় নাই তাহারা "ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু" তাহারা ভূতলে মৎপ্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হউক এবং "তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং" এবং পরিতৃপ্ত হইয়া পরম গতি লাভ করুক। তাই আজও এ দেশের ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষে পদদলিত কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষীর জন্য চতুষ্পথে খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া দেয়; যে কোন নিরন্ন অন্ধ আতুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হউক না জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাহাকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া থাকে; দৃষ্টিবিষ সর্পও যদি বহুকাল হইতে গৃহস্থের বাস্তুভূমিতে বাস করিয়া থাকে কেহই তাহার প্রতি কোনও রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করে না, জীর্ণ বা ফলন্তই হউক বাস্তবৃক্ষকে কেহই কাটে না, প্রত্যহ স্নানান্তে ধর্ম্মবুদ্ধিতে তাহার মূলে জলসেক করে; কেহ কেহ জীবের বসতিস্থল বলিয়া পানীয় জল বস্ত্রপূত করিয়া পান করে এবং আজও কোন কোন দেশে মার্জনী দ্বারা কীটাপসারণ ও পথশোধন করিয়া অনেকেই পথ চলিয়া থাকে।

যে জাতি দয়া ধর্ম্মে এত উচ্চ আমাদের বড় সৌভাগ্য যে আমরা সেই জা-

তিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য যে ইহার ভগ্নাবশেষের দীন সাক্ষিমাত্র হইয়া কেবল হাহুতাস করিতে আসিয়াছি। এখন এ দেশের আর কি আছে। এক সময়ে যেথানে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য কি বিজ্ঞান কি ধর্ম্ম সকল প্রকার শিক্ষার পৃষ্ঠবংশ স্বরূপ থাকিয়া বহু সংখ্য জ্ঞানী বীর কবি ও দার্শনিকের জন্ম দিয়াছে, হা! এখন তাহা এক ভীষণ মহাশ্মশান। এই মহাশ্মশানে সকল প্রকার শ্রীসৌভাগ্যের চিরসমাধি হইয়াছে। ব্যাপক অধীনতার ঘোর অন্ধকার ইহার সেই অত্যুজ্জ্বল প্রভাব নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল কারণ তেজ বল সাহস এখানে আর দৃষ্ট হয় না। যে দৃষ্টি পৃথিবীর সমস্ত ভোগ তুচ্ছ করিয়া তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত ছিল এখন তাহা একপ্রকার অন্ধ। এখন যে দিকে চাহিয়া দেখ ইহার সর্ব্বত্রই চিতাভস্মের স্তূপ। এই ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নি হইতে এক একটা নাতিউজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ এক এক বার উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এবং ফেরু-দল আরও অশুভ আনয়নের জন্য কর্কশ স্বরে চিৎকার করিতেছে। হা! এই কি সেই ভারত! ইহার পূর্ব্বগৌরব তো সবই গিয়াছে, কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এখনও কবিরা সজলা সফলা সশ্যশ্যামলা বলিয়া শ্লাঘার সহিত ইহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ সেই ভারতে লোমহর্ষণ দারুণ অন্নকষ্ট। দুই পদ অগ্রসর হইয়া যাও দেখিবে অন্ন বিনা লোকে হাহাকার করিতেছে। এক আধটী নয় অসংখ্য অসংখ্য লোক ক্ষুধার দুর্বিষহ জ্বালায় হাহাকার করিতেছে; সকলেই অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট। পিতা ক্ষুধার্ত্ত আসন্ন-মৃত্যু দুর্ব্বল শিশুর অস্ফুট কাতর ক্রন্দন আর সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছে আর সেই নিরুপায় শিশু অস্থিচর্ম্মসার মাতার বক্ষে তাহারই সহিত অনন্ত কালনিদ্রায় নিলীন রহিয়াছে। কোথাও কত স্ত্রী তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্বামি ত্যাগ করিতেছে, আবার কত স্বামী সমস্ত স্নেহ বন্ধন ছিঁড়িয়া ভগ্নমনে দেশত্যাগ করিতেছে। কোথাও জল নাই, তৃণ নাই, গো মহিষাদি অসংখ্য পশু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিয়া রহিয়াছে, শৃগাল কুক্কুর তাহাদের মৃত দেহ চর্ব্বণ করিতেছে এবং তাহা হইতে পূতিগন্ধ নির্গত হইয়া গ্রামে গ্রামে মহামারী উৎপাদন করিতেছে। এ সমস্ত অতিরঞ্জিত কথা নয়, একটু অগ্রসর হও এই শোকাবহ দৃশ্য অহর্নিশি তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। বলিতে কণ্ঠরোধ হয়, এখন সমগ্র ভারতের এই রূপই দুর্দশা। আজ কএক বৎসর ধরিয়া দারুণ দুর্ভিক্ষ লোকের অস্থিচর্ম্ম নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এবার ইহার বড় ভীষণ ও ব্যাপক আকার। হা! এমনও সময় ছিল যখন এ দেশের গৃহস্থের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। এখনও ইহারা পিতামাতার ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্যকালে প্রার্থনা করে "দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং" আমাদের কুলে দাতা বৃদ্ধি হউক, "বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি" দেয় দ্রব্য আমাদের গৃহে পরিপূর্ণ হউক, "যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু" আমাদের নিকটেই প্রার্থীরা আসুক, "মাচ যাচিস্ম কঞ্চন" আমরা যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা না করি। হা! আজ ভারতের সেই গৃহস্থের গৃহে অন্ন নাই। আজ ইহারা কঠোর জঠরজ্বালায় অস্থির। আজ ইহাদিগকে অন্তত এক দিনের তরেও যিনি এক মুষ্টি দিবেন তিনিই ধন্য, তিনিই ধন্য। তাঁহার জন্ম

সার্থক, কর্ম্ম সার্থক, অর্থ সার্থক। বিধাতা, জানি না, এ দেশের ভাগ্য কোন্ চক্রে ঘুরিতেছে কিন্তু আমরা কোন্ পাপে কার পাপে এত কষ্ট পাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

———

পরে শ্রীযুত শিবধন বিদ্যার্ণব এই প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

হে শান্তিময় প্রভো! সংসারের বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তি ভোগের পর আজি সংবৎসর পরে শান্তিনিকেতনের উৎসবে শান্তি পাইবার আশায় আমরা সকলে সমাগত হইয়াছি। ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষিদেব এই নির্জ্জন প্রান্তরস্থিত পবিত্র আশ্রমে তোমার পবিত্র সহবাসে অপার শান্তিলাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই ইহার নাম শান্তি নিকেতন, শান্তিময় বিশ্বপতি তুমি এই আশ্রমের শান্তিদাতা অধীশ্বর রূপে নিত্য বর্ত্তমান, অসংখ্য ভগবৎপ্রেমপিপাসু সাধু সজ্জন এই পবিত্র মন্দিরে তোমার মঙ্গলময় ভাব, শান্তিময় রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হ'ন, সেই জন্যই ইহার 'শান্তিনিকেতন' নামের সার্থকতা। আজি শান্তিনিকেতনের উৎসব, শান্তি নিকেতন শব্দের দুইটি অর্থ, এক শান্তির নিকেতন, অর্থাৎ যে স্থানে আসিয়া লোকে শান্তি পায়, আর শান্তির নিকেতন অর্থাৎ শান্তির আধার অর্থাৎ শান্তিময় তুমি, দুইই মূলতঃ এক, কারণ সাধুসজ্জনগণ এখানে আসিয়া যে, শান্তিলাভ করেন, সেই শান্তিও তোমাকেই লইয়া, বস্তুতঃ শান্তিনিকেতন শব্দের লক্ষ্য সর্ব্ব প্রকারেই তুমি; সুতরাং "শান্তিনিকেতনের উৎসব বলিলে তোমারই উৎসব বুঝাইতেছে। তোমাকে লইয়াই শান্তি নিকেতনে আমাদের উৎসব, অথবা তুমিই শান্তিনিকেতনের উৎসব-কর্ত্তা। তুমিই উৎসব করিতেছ আমাদিগকে লইয়া। তুমি স্বপ্রকাশ, তোমাকে প্রকাশ করিবার কাহারও সাধ্য নাই, সুতরাং তোমাকে লইয়া আমাদের উৎসব করিতে হইলে তুমি যদি কৃপা করিয়া প্রকাশিত না হও, তবে আমাদের সমস্ত আয়োজন, সমস্ত উদ্যোগ নিস্ফল, সমস্তই বৃথা; আজি তুমি উৎসবের অধীশ্বর হইয়া শান্তিদাতা রূপে প্রকাশিত হইয়া শান্তিনিকেতনের উৎসব সম্পন্ন কর; আমরা তোমার উৎসবে প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে তোমারই দ্বারে সম্মিলিত হইয়াছি। আমরা তোমাকে লইয়া উৎসব করিব তুমি আমাদিগকে লইয়া উৎসব করিতে প্রকাশিত হইতেছ বলিয়া, না হইলে আমাদের এমন সাধনবল নাই এমন ভক্তিবল নাই যে, তাহার প্রভাবে তুমি আমাদের উৎসবে প্রকাশিত হইবে। তুমি আমাদিগকে লইয়া উৎসব করিতেছ ইহাই সত্য, সেই জন্যই প্রভাত সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়াকাশে স্বপ্রকাশ সূর্য্যের উদয়চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, সেই জন্যই ক্রমশঃ স্বপ্রকাশ সূর্য্যের আনন্দরশ্মিরেখা আমাদের অন্তরে বাহিরে দীপ্তি পাইতেছে। নাথ! স্বপ্রকাশ সূর্য্য! তুমি আজি সম্পূর্ণ রূপে আমাদের হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হও, তোমার প্রকাশে আমাদের পাপ তাপ, শোক দুঃখের গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হউক, আমরা তোমাকে তোমারই আলোকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া জন্ম-জীবন চরিতার্থ করি; আর তোমার নিকটে দাঁড়াইয়া আমরা সকলে প্রেমানন্দে প্রেম কণ্ঠে বলি,—

অদ্য নাথ বয়ং ধন্যা ধন্যংনো জীবনং প্রভো।
পরিদৃষ্টো যতোঽস্মাভিঃ পূর্ণব্রহ্মসনাতনঃ॥

দয়াময়! তোমার নিকটে আমরা শত অপরাধী, কতপ্রকারে সতত আমরা তোমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন করিয়াছি; সেজন্য তুমি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর, তবে আমরা কোথায় যাইব? তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ভূমিতে পদস্খলন হইলে ভূমিই অবলম্বন হয়, তোমাতে শত অপরাধী আমরা,—কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র শরণ, তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়;

"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং।
ত্বয়ি মে চাপরাধাশ্চ ত্বমেব শরণং প্রভো॥"

অদ্যকার এই মহোৎসবে তুমি যেমন আনন্দদাতারূপে এবং আনন্দরূপে, শান্তিদাতারূপে এবং শান্তিরূপে আমাদের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত হইতেছ; সেইরূপ নিত্যকাল—চিরজীবন আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত থাকিয়া আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তোমার শান্তি নিকেতনের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ কর, ইহাই তোমার নিকটে আমাদের প্রার্থনা।

নানাব্যাধিসমাকুলোহস্মি ভুবনে তন্নাশকত্বাং বিনা,
জাতোনৈব ভবেৎকদা ভবসুহৃদ্ ভীতোহস্মি তস্মাৎপ্রভো
সর্ব্বত্র শ্রুতমস্তি সাধুকথিতং নাম্না পবিত্রেণ তে,
নির্ব্যাধিশ্চ ভবেজ্জনস্তব গুণধ্যানেন শান্তাত্মনা॥ ১॥

নমামি সত্যং শিবসুন্দরং বিভুং,
ভজামি নিত্যং করুণালয়ং প্রভুং।
স্মরামি তং শান্তিনিকেতনেশ্বরং,
করোমি তন্নাম শুভং নিরন্তরং॥ ২॥
ধ্যেয়ং পরং সুরনরার্চ্চিতপাদপদ্মং,
শান্তং শিবং সুজনশান্তিনিকেতনেশং।
জ্ঞানামৃতং ভজন-সাধনহীনচিত্তঃ,
দেবং নমামি প্রণতার্ত্তিহরং বিশুদ্ধং॥ ৩॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মধ্যাহ্নের ব্যাপার স্মরণ করিলেও সুখোদয় হয়। এবার বিশ্রামের পর ব্রহ্মমন্দিরে খোল করতাল সহযোগে রাজকুমার বাবুর কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার সেই "হৃদয় নিকুঞ্জবনে" গানটী যেন এখনও কর্ণে মধুবৃষ্টি করিতেছে। বেলা দুই প্রহরের পর হইতেই উদ্যানের ইতস্তত অনেকগুলি বাউলের দল গোপীযন্ত্র বাজাইয়া এবং তালে তালে নৃত্য করিয়া দেহতত্ত্ব প্রভৃতি নানাতত্ত্ব গান করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল। দেখিলাম কোন কোন স্থানে বহুসংখ্য ক্ষুধার্ত্ত দীন দরিদ্র দলে দলে সুপ্রস্তুত অতি উপাদেয় খেচরান্ন উদর পূর্ণ করিয়া খাইতেছে এবং যে যত পারিতেছে বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কোথাও দোকান পসার খুলিয়া অনেকে নানারূপ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। কোথাও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি সাঁওতাল গৃহিণীরা নূতন-জলধরকান্তি গুঞ্জাবতংসশোভিত শিশুগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদেরই নিমিত্ত নানারূপ ক্রীড়নক কিনিতেছে। কোথাও সুশিক্ষিত মধুরকণ্ঠ কলাবৎ তানলয়স্বরসংযোগে হিন্দী ভজন ধরিয়াছেন। স্থানে স্থানে বৃক্ষমূলে সুরচিত ক্ষুদ্র বেদিতে বসিয়া অনেকে মহা আরামে সর্ব্বতঃ-প্রবৃত্ত উৎসব উপভোগ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকেই আনন্দের মহাকল্লোল! বিস্তীর্ণ প্রান্তরের যে দিকে চাও দেখিবে এই মহা মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত দূর হইতে দলে দলে লোক সকল আসিতেছে। এবার চক্ষু কর্ণের তৃপ্তিকর অন্য কোনও রূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না তথাচ এত লোক! ধন্য ঈশ্বর, তুমিই ধন্য, শান্তিনিকেতনে যেন চিরকাল এইরূপে কেবল তোমারই নামে সকলকে সমবেত দেখিতে পাই।

এইরূপে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। রক্তচ্ছবি সূর্য্য ক্রমে অস্তমিত হইল।

সুপ্রশস্ত কাচময়-গৃহে নানাবর্ণের আধারে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে শ্রদ্ধাস্পদ মঠাধ্যক্ষ স্বামী জী সাধকের মন পুলকিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

ব্রহ্মোপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

ভয় হইতে ঈশ্বরোপাসনার সূচনা, প্রীতিতে ঈশ্বরোপাসনার সমাপ্তি। মনুষ্য যখন হইতে উপলব্ধি করে যে পাপের দণ্ডদাতা পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এক সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ মস্তকের উপরে থাকিয়া, তাহার সকল কার্য্য সকল চিন্তা গূঢ়রূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখনই সে শিহরিয়া উঠে, দায়িত্বের ভাব তাহার অন্তরে জাগ্রত হয় এবং সে বলিতে থাকে পাপের প্ররোচনায় আমি আর ভুলিব না, "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং" ঈশ্বরের ভীতিপ্রদ ভীষণ বজ্র আমার উপরে ঝুলিতেছে, জানি না কখন আমাকে ধরাশায়ী করিবে।

ধর্ম্মের একবার বিকাশ হইলে, প্রতি স্বার্থত্যাগ—প্রতি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যবহিত ফলে যতই পবিত্র আত্মপ্রসাদের প্রাণদ স্বর্গীয় বারি আত্মায় সিঞ্চিত হইতে থাকে, ধর্ম্মভাব ততই পরিস্ফুট হইয়া আইসে, ঈশ্বরের উৎসাহজনন প্রেমমুখের আভায় ততই তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে থাকে। ক্রমে ধর্ম্মভাব মনুষ্যের আত্মার সহজ ভাব হইয়া দাঁড়াইলে ঈশ্বরকে আর ধর্ম্মজগতের কঠোর শিক্ষক বলিয়া বোধ হয় না, আত্মবিসর্জ্জনে শোক থাকে না। মনে হয় ঈশ্বরের নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি এবং সেখানে বসিয়া ঈশ্বরকে নূতন ভাবে উপলব্ধি করিতেছি এবং তাঁহার প্রেরিত আত্মপ্রসাদের বিমল জ্যোৎস্নার অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বর্গীয় গভীর শান্তি উপভোগ করিতেছি। সে অবস্থায় যখন তাঁহার প্রতি আমাদের প্রার্থনা যায় আমরা তাঁহার আর রুদ্র ভাব উপলব্ধি করিতে পারি না; আমরা তাঁহাকে রুদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া পরক্ষণেই বলি "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে রক্ষা কর, তোমার কান্তভাবে তোমার শিবসুন্দর রূপে আমাদের নিকট আবির্ভূত হও। এইরূপে আমরা প্রীতিদ্বারা যখন তাঁহার প্রীতিভাব অনুভব করি তখন হইতেই বলিতে থাকি "রসোবৈ সঃ" তুমিই রস, তুমিই অমৃত, তুমিই আনন্দ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই চরাচর যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা তোমারই আনন্দের প্রবাহ। "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" তখন বায়ু সমুদ্র ওষধি বনস্পতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে মধুক্ষরণ হইতে থাকে।

আর একদিক দিয়া দেখ, বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনের মূলে, সাধনা মধ্যপথে এবং এই ঈশ্বরই আমাদের সিদ্ধি। সেই জন্য যাঁহারা অনন্তধামের যাত্রী তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাসের সম্বল আহরণ করিয়া লউন। তাহা না হইলে খানিক দূর গিয়া দিশাহারা হইতে হইবে। আমরা কত লোককে দেখিলাম তাঁহারা উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের পথের পথিক হইলেন, কতক দূর অগ্রসর হইলেন, সম্বল ফুরাইয়া গেল, যেখান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও পশ্চাতে নিপতিত হইলেন। তাই বিশ্বাসের কবজে আপনাকে মণ্ডিত কর। আত্মার মধ্যে অনুভব কর এক সর্ব্বদর্শী

বিধাতা এই জগতের স্রষ্টাপাতা, তিনি পাপের দণ্ডদাতা ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, আবার তাঁহাতে সকলে স্থিতি করিতেছে। ত্রিভুবন তাঁহারই জ্ঞান প্রেম আনন্দের বিকাশ। মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল তাঁহারই হস্তে। ধন মান বিষয় বিভব রূপ লাবণ্য সকলই এক সময় চলিয়া যাইবে কেবল তিনি থাকিবেন আর পাপে মুহ্যমান বা পুণ্যে তেজীয়ান আমাদের আত্মা থাকিবে। এইগুলি ধর্ম্ম-সাহিত্যের বর্ণমালা, ইহাদের সহিত তোমার পরিচয় না হইলে এই ধর্ম্মরূপ মহাকাব্যের রসাস্বাদন সুদূরপরাহত। খগোল রসায়ন,জ্যোতিষ অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে অর্দ্ধজীবন চলিয়া যায়। আর ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ কি এতই সুলভ যে দুই চারিটি বক্তৃতা বা সাপ্তাহিক উপাসনা শ্রবণে তুমি ঈপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইবে। উপদেশ শ্রবণে হয়ত তুমি ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতে পার। কিন্তু এই পক্ষপাতিতাতে ফল কি, যদি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসকে আপনার মধ্যে জাগ্রত করিতে না পার। এই জন্য আজ কাল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, লোকে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র আলোচনায় মুক্তকণ্ঠ, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস নাই। নিজ জীবনে বৈরাগ্য-বহ্নি সন্ধুক্ষিত নহে। বরং অন্য দিকে সংসারকে ও নিজ জীবনকে প্রবৃত্তি ও ভোগের অনুকূল করিয়া গঠন করিতেছে, ত্যাগের পরিবর্ত্তে স্বীকারকেই অঙ্গের ভূষণ করিয়া তুলিতেছে,অনাসক্তির পরিবর্ত্তে আসক্তি শুদ্ধ এই ব্রাহ্মসমাজে কেন সমুদায় ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু হইয়া দাঁড়াইবার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম ধর্ম্মের মূলপত্তন—বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে দৈবী ও মানুষী বিপদ আসিয়া আমাদিগকে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিতে পারিত না। বিশ্বাস সাধনার পথ দেখাইয়া দিত, সাধনার মার্গ লইয়া চারিদিকে এত গণ্ডগোল উঠিত না। এই বিশ্বাসের সম্বল লইয়া যখনই আমরা ঊর্দ্ধপথে উঠিতাম, সত্যধর্ম্ম পরমেশ্বর স্বর্গ বাতায়নের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আলোক দর্শাইয়া আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতেন, ও পরিশেষে তাঁহার প্রীতিপ্রদ উদার ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দিতেন।

শাক্যসিংহ কেন পৈতৃক রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থমূলে ধূলির আসন বিছাইলেন, কেন গৌরাঙ্গদেব সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য লইলেন, কেন রামমোহন অশরীরী ঈশ্বরের সন্ধানে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিলেন, কেন দেবেন্দ্রনাথ আযৌবন কঠোরতা স্বীকার করিয়া পথে পথে ঘুরিলেন ? এই কয়েক জনের মধ্যে সাধনা বা সিদ্ধির তারতম্য থাকিতে পারে,কিন্তু আমি কেবল এখানে তাঁহাদের দুর্দ্দম্য আবেগের কথা বলিতেছি! এক বিশ্বাসই তাঁহাদিগকে গৃহত্যাগী করিয়াছে! কই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আমরা এরূপ কয়টি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। অনেকে কিছু কিছু ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু ধরিলেন কি। যদি ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকেন, ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকেন, অনাসক্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তাঁহারা কি বাস্তবিকই ঈশ্বরের সমক্ষে জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহারা কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কি হৃদয়ের কুটিল গ্রন্থি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মজীবন—ধর্ম্মজীবন চাই, তাহা না হ-

হইলে আমরা ব্রাহ্মসমাজকে চিরজীবী করিতে সহজে সক্ষম হইব না।

এই যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁহার দীক্ষার দিন স্মরণ করিয়া অদ্যকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি সে দিন বলিতেছিলেন যে এক সময় ঈশ্বরকে না পাইয়া আমার ঘোর মর্ম্মযাতনা উপস্থিত হইত, কিছুতেই শান্তি পাইতাম না। মনে হইত সূর্য্য কৃষ্ণ রশ্মি উদ্গীরণ করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এইরূপে দিন চলিয়া যায় পরে ঈশ্বর কৃপা করিলেন। তিনি তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশ করিলেন। সেই অবধিই আমি ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরমদেবের উপাসক। যতকাল জীবিত থাকিব ততদিন বলিব তিনি আছেন, আমি তাঁর সাক্ষী। আর আমার দেহ অবসানে এই শান্তিনিকেতন আমার হইয়া তাঁহার সাক্ষী দিবে। তাই ওঁ মহামন্ত্র সত্যং ঋতং প্রভৃতি স্বরূপ লক্ষণে পরিবৃত হইয়া এই মন্দিরের শীর্ষদেশে সুবর্ণপ্রভায় জ্বলিতেছে।

বিশ্বাসের চক্ষে দেখ তবে তাঁহার এই কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে আকার ও অঙ্গ সৌষ্ঠব দিলেন, ব্যাখ্যান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ যাঁহার গবেষণার ফল, তিনি ভাবিলেন ইহাতেও বুঝি ব্রাহ্মধর্ম্ম অচলপ্রতিষ্ঠ হইল না। তাই তিনি লৌহ প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির অনুরূপ এই বিজন প্রান্তরে এই সুদৃঢ় মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ প্রস্তরে খোদিত করিয়া অশোকের অনুশাসনের ন্যায় এখানে নিখাত করিলেন! আপনাকে উর্দ্ধে তোল তবে ঈশ্বরের জন্য বিশ্বাসীর ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিবে। আমরা চলিয়া যাইব আমাদের সন্তান সন্ততি চলিয়া যাইবে, অথচ এই মন্দিরচূড়াস্থিত ঐ ওঙ্কার অনন্তকাল অসীম গগনকে আহ্বান করিয়া দিশাহারা মানবকুলের কর্ণে আশার সঙ্গীত নীরবে নিঃশব্দে ঢালিতে থাকিবে।

হে দেব, তুমি আমাদিগকে ভয়েতে পরিচালিত করিয়া অবশেষে তোমাকে প্রীতি করিতে শিক্ষা দাও; বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকে সাধনার পথে অগ্রসর কর এবং তোমাকে দান করিয়া সকল ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এই প্রার্থনা করিলেন।

হে অন্তরতম প্রিয়তম! তোমার নিকটে আজ্ উৎসবের দিনে প্রার্থনা করিব। কি প্রার্থনা করিব, তাহা তুমি অন্তরের মধ্যে থাকিয়াই জানিতেছ। প্রার্থনা আর সজ্জা করিয়া করিতে হইবে না। তাহা নিয়ত কালই অন্তরের উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে। মনের কথা তোমাকে নিবেদন করাই প্রার্থনা। এমন কথা আছে যাহা মাতার কাছে বলা যায়, পিতার কাছে বলা যায় না। পিতার কাছে বলা যায়, মাতার কাছে বলা যায় না। বন্ধুর কাছে বলা যায়, স্ত্রীর কাছে বলা যায় না। স্ত্রীর কাছে বলা যায়, বন্ধুর কাছে বলা যায় না। কিন্তু তোমার কাছে সকল কথাই বলা যায়। শুধু বলা যায় তাহা নহে, না বলিলে থাকা যায় না। তুমি সকলই জান, তবু না বলিলে থাকা যায় না। তুমি আত্মাকে এমনি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ, যে মনের কথা মনের ব্যথা, তোমার নিকট ব্যক্ত না করিলে তাহা থাকিতে পারে না। তাই

সুখ হউক, দুঃখ হউক, সম্পদ হউক, বিপদ হউক, যে সময়ে যেমন অবস্থা হউক মন তাহা তোমাকে না জানাইতে পারিলে কিছুতেই প্রবোধ মানে না। দুঃখের সময় সত্বর হইয়া বলি, শীঘ্র দুঃখ হইতে মুক্ত কর, যদি তাহাই কর, কৃতজ্ঞ হইয়া তোমার চরণে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করি। যদি বারম্বার ডাকিলেও সাড়া না দাও, তবুও তোমার চরণ ছাড়ি না। ঐ চরণেই আশা রাখি। জানি তুমি মঙ্গলময়, সময় উপস্থিত হইলেই, দুঃখ দূর করিবে। তুমি যদি মনে কর, অশ্রু আকর্ষণ করিবে, কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? যখন সুখ সম্পদে রাখ,তখন যে দিকে চাই তোমাকেই দেখি,তোমার সুখ-স্বরূপই দেখিতে পাই। মনে করি এই সুখ—এই প্রসাদ কেমন করিয়া চারিদিকে সকলকে বিলাইব? নাথ! তোমার করুণা আমি কেমন করিয়া বলিব? কত বার বিপদে পড়িয়া ডাকিয়াছি, অতি কাতরে ডাকিয়াছি, দেখিয়াছি, তোমার করুণা অবতীর্ণ হইয়া আমাকে শত বার রক্ষা করিয়াছে। তথাপি আমি এমন দুর্ব্বল, যে নূতন বিপদ উদ্যত বজ্রের ন্যায় মস্তকে পড়িবার উপক্রম করিলেই ভীত হই। জানি তুমি আমাকে কখনই পরিত্যাগ কর নাই, এবং কখনই পরিত্যাগ করিবে না, তথাপি কেন আতঙ্ক উপস্থিত হয়। হে দেব! এই ভীতি হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে অভয়দাতা! তুমি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, যাহার প্রভাবে ভয় আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। "শ্রী, সম্পদ, ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে" সেই শরণ আমি তোমার নিকটে ভিক্ষা করি। তোমার প্রতি বিশ্বাসই ভব-ভয় নিবারণের মূল মন্ত্র। সেই মন্ত্রে তুমি আমাকে দীক্ষিত কর, সেই মন্ত্রে সিদ্ধ কর।

হে বিশ্বনাথ! এ ঘোরতর সংসারে আমি কিছু আপনা আপনি আসি নাই, তুমিই আমাকে আনিয়াছ। এ অতি কঠিন স্থান, কঠোর শিক্ষার স্থান। এ সুখের স্থান নহে। এখানে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভাল বাসা, স্নেহের পরিবর্ত্তে ভক্তি, ভক্তির পরিবর্ত্তে স্নেহ অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। এখানে "যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাই, সে শত্রুর রূপ ধারণ করে"। যাহা অমৃত মনে করিয়া পান করিতে যাই তাহা বিষ রূপে পরিণত হয়। এখানে মনুষ্য, মনুষ্যকে হনন করিবে বলিয়া অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। এখানে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আঘাত করিবে বলিয়া চিরশত্রু অবসর অন্বেষণ করে। ধর্ম্মান্ধ হইয়া এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর শিরশ্ছেদন করে। অতি উৎকট পাপীও ধার্ম্মিকের প্রাণ হিংসা করিয়া পৈশাচিক হাস্য ও নৃত্য করিতে থাকে। কে ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারে? হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর, তুমি তাহা জান। আমি কেবল ইহাই জানি, যে তুমি আমার আশ্রয়। তুমি আমায় যেমন অবস্থায় রাখিবে তেমনিই থাকিব। আমার কোন শক্তিই নাই, আমি তোমারই। এ শরীর এ প্রাণ এবং অল্প বিস্তর যাহা কিছু দিয়াছ, সকলি তোমার। আমি তোমার দাস, তোমার ছায়া মাত্র। তাহা লইয়া যাহা করিবার তুমি তাহাই কর। এই সকলই আমি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। যদি তোমার ক্রোড়ে থাকিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে হয়, শত্রু-হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তখনও যেন তোমাকে না ভুলি, তখনও যেন

তোমার আনন্দ স্বরূপে চিরমগ্ন হইবার প্রার্থনা আমার ভগ্ন হৃদয় হইতে উত্থিত হইতে থাকে। এখন যে কয়দিন থাকিব, এ দীর্ঘ জীবন-পথে, যেন তোমার করুণার গান গাইতে গাইতেই চলিতে পারি। "স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ" এই অমৃতকথা ব্রহ্ম-সঙ্গীতে শোভা পাইতেছে; তুমি নাথ, কিন্তু এই সঙ্গীত আমার হৃদয়ে জলদক্ষরে লিখিয়া দাও। স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির ফুলে তুমি আমার হৃদয়-উদ্যানকে শোভিত কর। এ জীবনে স্নেহের পাত্রকে স্নেহ, প্রেমের পাত্রকে প্রেম, দয়ার পাত্রকে দয়া, ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিলে, কি নির্ম্মল আনন্দেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। দয়াময়! তুমি আমাকে সে আনন্দে বঞ্চিত করিও না। আর সকল আনন্দের উপর যে আনন্দ, সকল সুখের উপর যে সুখ, কিনা তোমার পূজার আনন্দ—পূজার সুখ, সে আনন্দ সে সুখ তুমি আমাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঢালিয়া দাও, আমি সেই আনন্দ-রস পান করিতে করিতেই যেন তোমার আনন্দধামে উপনীত হই। হে দেব! পুনর্ব্বার ভক্তি-যোগে কাতর প্রাণে বলি, তুমি আমাকে সংসারের বিপত্তি ও পাপ তাপ হইতে করুণা করিয়া মুক্ত করিয়া তোমার আনন্দময় অভয় ক্রোড়ে স্থান দাও। এই আমার কামনা—এই আমার প্রার্থনা। দয়াময়! দয়াময়! কোথা নাথ! অনাথ-নাথ, অতি দুঃখী আমি, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর, আমার হৃদয়ে আসীন হও, আমার দুঃখের রজনী অবসান হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি নির্ম্মল চন্দ্রালোকে উদ্যানভূমির বড়ই শোভা হইয়াছে। তন্মধ্যস্থ সুধাধবল সৌধের উপর চন্দ্র-কিরণ পড়িয়া তাহা যেন রজতময় করিয়া তুলিয়াছে এবং সমস্ত বৃক্ষলতা জ্যোৎস্না-জলে সিক্ত হইয়া অতি পবিত্র শ্রী ধারণ করিয়াছে। আমরা এই শোভা সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এবং দ্বিপেন্দ্র বাবুর আতিথ্য ও আদর যত্নে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

সুগ্রীব দূর হইতে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য দূত হনুমানকে রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। হনুমান বীর ও বক্তা ছিলেন। রাম তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলেন যে ঋক্ যজু সামবেদে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, এবং তাঁহার মুখ হইতে ব্যাকরণদুষ্ট একটি পদও বহির্গত হয় নাই। সে যাহা হউক ক্রমে সুগ্রীবের সহিত রামও লক্ষ্মণের মৈত্রী স্থাপিত হইল। রামচন্দ্র স্বীকার করিলেন যে বালীকে বধ করিয়া তাঁহার পত্নী রুমাকে উদ্ধার করিয়া দিবেন। পরে তিনি নিজবলের পরিচয় দিয়া সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন জন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং তালবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিলেন। স্বর্ণখচিত শর মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার তূণীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব যার পর নাই বিস্মিত হইয়া রামকে কহিলেন, সখে! চল আমরা ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করি ও সেই ভ্রাতৃগন্ধী বালীকে সংগ্রামে নিহত করি। রাম তাহাতেই সম্মত হইলেন।

তাঁহারা কিষ্কিন্ধ্যায় সমাগত হইলে রাম সুগ্রীবকে বালীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুগ্রীব হীনবল হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইয়া বালিবধার্থ ভুজঙ্গভীষণ শরসন্ধান পূর্ব্বক কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করে, সেই রূপে আকর্ষণ করিলেন। প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য

শর ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবামাত্র বালীর বক্ষঃস্থলে প্রোথিত হইয়া গেল। বালী আহত ও হতচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাহা দেখিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। বালী রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি যুদ্ধার্থ অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল। আমি জানিতাম তোমার ধৈর্য্য বীর্য্য ও উৎকৃষ্ট আভিজাত্য আছে। আমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে অসাবধান আছি, এ সময়ে আমাকে হনন করা তোমার উচিত হয় নাই। দেখিতেছি তুমি দুরাত্মা ধর্ম্মধ্বজী ও অধার্ম্মিক। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কোন অনিষ্ট করি নাই, বা তোমাকে অবজ্ঞা করি নাই, কেন তুমি আমাকে অকারণে বধ করিলে। তুমি ধূর্ত্ত শঠ ও ক্ষুদ্র। রাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

রাম প্রত্যুত্তরে কহিলেন যে তুমি সুগ্রীব-স্ত্রী রুমাকে হরণ করিয়াছ। শাস্ত্রানুসারে রুমা তোমার পুত্রবধূ-সদৃশ। তোমাতে পাপ অর্শিয়াছে, এই জন্য তোমায় দণ্ড দিলাম। সুগ্রীব আমাকে সীতাউদ্ধারে সাহায্য করিবেন এবং আমি প্রতিশ্রুত আছি যে তোমাকে বিনাশ করিব। প্রতিজ্ঞা পালন আমার ধর্ম্ম, সুতরাং তোমার বিনাশে আমাতে পাপ অর্শে নাই। লোকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে থাকিয়া বাগুরাদি কূট উপায়ে মৃগ বধ করে। রাজারা অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকেন; তুমি শাখামৃগ—বানর; যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই তোমাকে বধ করিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি।

বলিতে কি রামের প্রত্যুত্তরে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। (পাঠকেরা পরে দেখিবেন বালীর স্ত্রী তারা ভবিষ্যতে এই সুগ্রীবের মহিষী হইয়া দাঁড়ায়। জ্যেষ্ঠের স্ত্রী মাতৃসদৃশ, তাহা জানিয়াও ত রাম সুগ্রীবকে কখনও কোন কথা কহেন নাই।) যুদ্ধকাণ্ডে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ সময়ে এমন কি রাক্ষসগণও বালিবধের কলঙ্ক অবাধে রামের উপর অর্পণ করিয়াছিল। ফলত রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লুক্কায়িতভাবে বালিবধ আমাদের নিকট কেমন ঠেকে। অথবা ইহাই দুর্ব্বলপ্রকৃতি নরনারীর দুর্ব্বলতার পরিচয়। তাঁহারা যে বাস্তবিক মনুষ্য, দেবতা ছিলেন না এইগুলিই যেন তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী।

এদিকে রামশরে স্বামীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রোরুদ্যমানা তারা পুত্র অঙ্গদ সমভিব্যহারে প্রাসাদ হইতে বহির্গতা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিলেন, এবং মাতঙ্গতুল্য বালীকে নিহত দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। রামের দুষ্কার্য্যের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতেও ত্রুটি করিলেন না। হনুমান অগ্রসর হইয়া তারাকে কহিলেন তুমি স্বয়ং শোচনীয়, তুমি আবার কোন্ শোকার্হ ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ; তুমি নিজেই দীন, তুমি আবার কোন্ দীনের প্রতি দয়া করিতেছ; জানি না এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে আবার কাহার জন্য দুঃখিত হইতে পারে।

শোচ্যা শোচসি কং শোচ্যং দীনং দীনানুকম্পসে।
কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্বুদোপমে।

এ শ্লোঃ। ২১ অধ্যায়।

এরূপ সান্ত্বনা ভাসিয়া গেল, তারা নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্রও চাহি না, এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। সুগ্রীব এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পুরবাসীগণের কাতর ক্রন্দনে, তারার আর্ত্তরবে, জ্যেষ্ঠের মৃত দেহ দর্শনে তাঁহারও শোকসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি রামের নিকট গিয়া কহিলেন, আমি জ্যেষ্ঠের রাজ্য চাহি না, ভ্রাতৃবধজাত স্বর্গও আমার স্পৃহনীয় নহে, পূর্ব্বে ভ্রাতৃবধে আমার অভিমত ছিল কিন্তু এক্ষণে ভ্রাতার বি-

যোগে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। হায় বালী আমার প্রতি কত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু কখনও তিনি আমার প্রাণবধের জন্য লালায়িত হয়েন নাই। কিন্তু আমা হইতে তাঁহার নিধন ঘটিল! আমি চিরদিনের জন্য ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া কোন মতে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব। রাজ্যসুখ আমি চাহি না।

তারা কাঁদিতে কাঁদিতে রামের সম্মুখে আসিয়া কহিল, তুমি যে বাণে বালিকে বধ করিলে তাহা দ্বারা আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইব। তুমি যেমন এই রমণীয় শৃঙ্গে জানকীর জন্য ব্যাকুল হইতেছ, বালিও স্বর্গে আমার বিরহে সেই রূপ ব্যাকুল হইতেছেন। আমাকে বধ করিলে তোমার স্ত্রীহত্যাদোষ ঘটিবে না। আমি বালির আত্মা এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর। এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রামও সাশ্রু নয়নে সুগ্রীব ও তারাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন এবং বর্ষাকাল সমুপস্থিত দেখিয়া রাবণবধে ক্ষান্ত থাকিয়া সকলে শীতাগমের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বর্ষা অতীত হইয়া গেল, অথচ সুগ্রীব তারা ও রুমার ভোগসুখে প্রমত্ত, ইহা দেখিয়া হনুমান তাঁহাকে কহিলেন দেখুন রাম অপবাদ-ভয় না করিয়াও তোমার প্রিয় সাধনার্থ দুর্জ্জয় বালিকে বিনাশ করিয়াছেন। অতএব তোমার আর উদাসীন থাকা বিধেয় নহে। সুগ্রীব তারা ও হনুমানের উত্তেজনায় ও লক্ষ্মণের তাড়নায় প্রবুদ্ধ হইয়া সীতার অনুসন্ধানের জন্য নানাদিকে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হনূমান নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া বিফল হইয়া পরিশেষে জটায়ুর সহোদর সম্পাতির নির্দ্দেশ ক্রমে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই খানেই কিষ্কিন্ধা কাণ্ড সমাপ্ত হইল।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৭, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৯২৮৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	২২৩২৲
সমষ্টি	২৫২৪৮৶০
ব্যয় ...	৩০৭।০
স্থিত ...	২২১৭॥৶০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত ১৪৫৭৻৯

দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

	১৯৫৭৻৯
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	২৫৩॥৵৩
	২২১৭॥৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১১১৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শুভকর্ম্মের দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ আচার্য্য	১৲
	১১১৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৫৮০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
„ „ নবকুমার দাস, চাঁদপুর	৫৲
„ „ অধরচন্দ্র পাল, ক্ষীরপাই	৩৵০
„ মহারাজা বাহাদুর অব্ দিনাজপুর	৩৵০
	১৫৮০
পুস্তকালয়	১০৶০
যন্ত্রালয়	১৫৬৲
সমষ্টি	২৯২৮৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭১॥৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩১।০
পুস্তকালয় ...	২০৶৬
যন্ত্রালয় ..	৮৪৶৯
সমষ্টি	৩০৭।০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪৩ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

সপ্তষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ শনিবার।

প্রাতঃকালে সমস্ত গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইলে সর্ব্বপ্রথম বন্দনা গীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

আমার একটী বড় সুন্দর গাভি আছে। তার বয়স খুব বেশী। এখন সে যেন ঠিক সেই ছান্দোগ্যের গাভি—পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়া। কিন্তু তাহাকে আমি বড় গৌরবের চক্ষে দেখি। যদিও সে এখন অথর্ব্ব তথাচ তার প্রতি আমার অনুরাগ কিছুই খর্ব্ব হয় নাই। আমি আশৈশব তার যথেষ্ট দুগ্ধপান করিয়াছি। বলিতে কি, আমার যা কিছু পুষ্টি সমস্তই তাহা হইতে। আজ দশ বৎসরের পর এই প্রাতঃকালে ব্রহ্মোৎসবের জন্য যে গৃহে আইলাম ইহা আমার সেই ছান্দোগ্যের গাভি। তবে পার্থক্য এই আমার সেই গাভি হইতে আমিই উপকার পাইয়াছি কিন্তু ইহার নিকট কেবল তুমি আমি নই সমস্ত বঙ্গদেশ—উত্তর হিমালয় হইতে দক্ষিণ কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত অনেকেই ঋণী।

কিছুকাল পূর্ব্বের কথা একবার স্মরণ কর। যখন মোগল শাসন বিলুপ্ত কিন্তু শুভঙ্করী অঙ্ক ও যৎসামান্য পারসীক ভাষা এ দেশের উচ্চ শিক্ষাস্থান অধিকার করিয়া আছে, প্রাচীন ঋষিদিগের অধ্যাত্মবিদ্যা কেবল বেদাদি গ্রন্থে বদ্ধ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অভাবে তাহার কিছুমাত্র প্রচার নাই, এবং ধর্ম্ম কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পর্য্যবসিত, সেই ঘোর অজ্ঞানতার ভিতর একটা দেশব্যাপী জ্যোতি সর্ব্বাগ্রে কোথা হইতে জ্বলিয়া উঠে? নিরপেক্ষ ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সকলকেই আহ্বান করিতেছি, বল, সেই সময়ে—পল্লীগ্রামের কথা দূরে থাক্ এই মহা নগরীতেই যখন শিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—সেই সময়ে এই অজ্ঞানোপহত দেশে সর্ব্বাগ্রে কোথা হইতে তিমিরনাশী সূর্য্য উদয় হইয়াছিল?' আমি মুক্তকণ্ঠে দম্ভের সহিত বলিব তাহা এই ক্ষুদ্র গৃহ হইতে—যেখানে আমরা আজ বহুদিনের পর ব্রহ্মোৎসবের জন্য সমবেত হইয়াছি।

যদিও ইহা এখন ইষ্টকময় কিন্তু ইহার অটল ভিত্তি ভাবী যুগে লোকের মানস-ক্ষেত্রে অক্ষয় উপাদানে বিরচিত হইবে সন্দেহ নাই।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের কাল চিন্তার কাল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাল চিন্তা ও কার্য্যের কাল। এই সাধুশীল যুবা ধর্ম্মে স্বায়ত্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া এবং বিষয় ভোগে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়া ঐরূপ সময়ে দেশের দুর্দ্দশা মোচনে বদ্ধপরিকর হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন উচ্চ ধর্ম্ম এবং উচ্চ শিক্ষাই সর্ব্বাঙ্গীন দেশোন্নতির মূল এবং যে কোন বিভাগে যে কোন হিতকর কার্য্য হউক না তাহা ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনও অংশে সুফল প্রসব করিবে না। এক সময়ে এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় একান্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি হৃদয়ের এইরূপ আবেগে সর্ব্বাগ্রে এই গৃহে আইলেন? তাঁর সঙ্গে যিনি জাতিগত উন্নতি ও অধঃপাতের মূল-সূত্র ইতিহাসের পত্রে পত্রে পাঠ করিয়াছেন সেই পুরাবৃত্তবেত্তা আইলেন। দেশ-ব্যাপী একটা ঘোর অবসাদের সময় যিনি স্মরণাতীত অতীতের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধার এবং সেই গৌরবে সকলকে মাতাইয়া উদ্যম ও উৎসাহে বর্ত্তমানকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন সেই পুরাতত্ত্ববেত্তা আইলেন। জ্ঞান বিজ্ঞান সাধারণে বোধসুলভ করিবার জন্য যে পরিমাণে ভাষাসংস্কার আবশ্যক সেই ভাষাসংস্কারক আইলেন এবং যাঁহারা অগাধ অতলস্পর্শ শাস্ত্র-সমুদ্রের সুগভীর তলে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা হইতে জ্যোতিষ্মান রত্ন উদ্ধারে সহায়তা করিবার জন্য সেই সমস্ত শাস্ত্রী আইলেন। এক সময়ে ইহাঁরা সকলেই ঐ একমাত্র অধিনায়কের মঙ্গল সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তখন সর্ব্বত্র নানা বিষয়ক জ্ঞানের সহিত মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতে লাগিল, তান্ত্রিক মদ্য মাংসের ভিতরে নিরামিষাহার প্রবর্ত্তিত হইল, চরিত্রশোধনের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল, মিথ্যাচার মিথ্যা ব্যবহারে অনেকের ঘৃণা জন্মিল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চ কথা এমন কি বালকের মুখেও ঘোষিত হইতে লাগিল। বলিতে কি, তখন এই বঙ্গদেশ একটা দীপ্ত আলোক-রশ্মিতে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ এই দেশ বিদেশের বিস্তীর্ণ লোকসমবায় মধ্যে যদি কেহ আমার ন্যায় বর্ষীয়ান আসিয়া থাকেন তিনিই বলুন আমার এই কথা সপ্রমাণ কি না।

জনসমাজের আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি ব্যাপক কাল সাধ্য। তাহা দুই এক দিনে হয় না। আজ আমরা যে প্রশস্ত উন্নতি-স্তরে দণ্ডায়মান আছি ইহার বীজ অতীতের কোন্ গভীরে তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় কোন না কোন সময়ে সামাজিক সকল প্রকার উন্নতির জন্য অতি নিভৃত হইতে চিন্তার একটা প্রবাহ মহাবেগে বহমান হইয়াছিল। উহা পক্ষ প্রতিপক্ষের ঘাতপ্রতিঘাতে ঘোর ঘূর্ণা ও তরঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়া যুগ যুগান্তের পথ অতিক্রম করিয়াছে। গতিপথে কতই বাধা কতই প্রতিরোধ। তৎপ্রভাবে ঐ প্রবাহ কোথাও শীর্ণ ও শুষ্ক এবং কোথাও বা অতি বিশাল। কিন্তু অতীতের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান কর দেখিবে ঐ সমস্ত প্রবল প্রতিরোধ হইতেই উহার অসার অংশ ফেন বুদ্বুদ রূপে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং উহা স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছ-

তর আকার ধারণ করিয়াছে। ফলত সমষ্টিগত উন্নতির নিয়মই এইরূপ।

ঐ বিরাগী যুবা সেই তমোময় কালে বঙ্গের বক্ষে সবেগে যে একটা প্রতিঘাত করিয়াছিলেন তাহা এ দেশের বহমান ধর্ম্ম ও সমাজগত চিন্তাপ্রবাহ উচ্ছেদের জন্য নয় কিন্তু তাহা অধিকতর নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য। তাঁহার এই সুমহৎ চেষ্টার অভ্যন্তরে দেশের যে কি গুরুতর কল্যাণ নিহিত আছে হয়তো তাহা এখন অনেকেই বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখেন না কিন্তু উত্তর কাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এখন আমরা বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন। শাসন ও বাণিজ্য একই হস্তে বিধৃত থাকায় আমাদের গৃহস্থলীর আবশ্যক উপকরণ হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত বিজাতীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। বলিতে কি ইহাতেও এই দেশের তত অনিষ্ট নাই, কিন্তু এই শাসনের সহিত আর একটা বড় সঙ্কট উপস্থিত। বিজাতীয় সাহিত্য আশৈশব আমাদের চিন্তা অধিকার করিতেছে। ইহার ফল অতি ভয়ানক। ইহার প্রভাবে কোন না কোন সময়ে আমাদের এই জাতির অস্তিত্বপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি দেশের ধর্ম্ম দেশের আচার সর্ব্বোতোভাবে অব্যাহত থাকে তবে যতই প্রবল কারণ উপস্থিত হউক না এই বহুকালের প্রাচীন জাতি কিছুতেই উচ্ছিন্ন হইবে না। অবশ্য বলিতে পার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ইতিহাসের একরূপ সূচীপত্র,তাহা দেখিলে কতকটা নিরাশ হইতে হয়। এ কথা খুব সত্য কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী পতনমুখে সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহাবেগে চলিয়াছে। ভূমি-মাহাত্ম্যে ইহার জল কোথাও স্বচ্ছ, কোথাও আবিল, কোথাও মিষ্ট কোথাও বা লবণাস্বাদ। এইরূপ স্থানবিশেষে উহা যে প্রকারই হউক না কিন্তু উহা সেই একই গঙ্গার জল, কালবশে ভূ-বিকার নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার মলহারিণী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেখ, এখন চতুর্দ্দিকে ঘোর বিপ্লব। এই অবস্থায় পিচ্ছিল পথে গতিশীল লোকের ন্যায় অনেকেরই পদস্খলন হইতেছে। পরিবর্ত্তন মাত্রই স্পৃহনীয়, তাহার ফলাফলের দিকে লোকে সম্পূর্ণ অন্ধ। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একই স্থানে বৃক্ষের ন্যায় অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছ। আজ আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝি বা না বুঝি কিন্তু উত্তর কাল ইহার সুফল ভোগ করিবে সন্দেহ নাই।

দশ বৎসর অতীত হইল আমরা পবিত্র মাঘোৎসরের জন্য আবার এই গৃহে আসিয়াছি। আজ যদিও ইহার জীর্ণসংস্কার হইয়াছে কিন্তু তাই বা কত কালের জন্য। নিশ্চয় এক সময়ে ইহার অভ্যন্তরে লূতাতন্তু বিস্তৃত হইবে, চামচিকা সকল চঙ্ক্রমণ করিবে এবং অশ্বত্থ বট সৌধতল ভেদ করিয়া ইহাকে ভূমিসাৎ করিবে। কালের হস্তে ইহার এই মহাবিনাশ কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই বঙ্গদেশে নিরাকার ঈশ্বরের ইহা আদি মন্দির। যিনি স্বমহিমায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান জ্ঞানযোগে তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিয়া ধ্যানযোগে এই গৃহে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পূজা হয়। যদিও কালে এই সমস্ত মৃৎপাষাণ নশ্বরতার পরিচয় প্রদান করিবে কিন্তু ইহার পবিত্র স্মৃতি কোন কালেই বিলুপ্ত হইবার নয়। ইহা পুরাণ ব্রহ্মের পুরাতন মন্দির। সুদূর ভবিষ্যতে ইহা নিশ্চয় লোকের মনে চিরনূতন হইয়া থাকিবে।

আজ আমাদের হৃদয়োৎসব। ব্রহ্মই

এই উৎসবের অধিষ্ঠাতা। তিনি আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া এইস্থানে আনিয়াছেন। চক্ষু কর্ণের তৃপ্তি হইতে পারে এমন কোন বাহ্য উপকরণ ইহাতে সংগৃহীত নাই তথাচ মনে যেন বসন্তের বায়ু বহমান হইতেছে। ধন্য ঈশ্বর তুমিই ধন্য। তোমার কৃপায় দগ্ধ মরুভূমিতেও বীজ অঙ্কুরিত হয়। আজ স্বদেশ বিদেশের বহু সংখ্য লোক তোমার নামে সমাগত হইয়াছেন। দেখিলে আশা হয় তোমারই কৃপায় তোমার এই সত্য ধর্ম্ম অচিরাৎ দেশময় বিস্তার হইবে এবং এই মহা মহোৎসব জাতীয় হৃদয়োৎসব হইয়া দাঁড়াইবে।

পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় নিম্নোক্ত রূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

সম্বৎসর কাল পরে আবার ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। আবার জ্ঞান ও ভক্তির স্রোত একত্রে মিলিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তীর্ণ করত দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত বেগে ঈশ্বরের পদতলের দিকে ছুটিয়া চলিল। আবার আরণ্যক ঋষিদিগের অন্তর্ভেদী মর্ম্মকথা কালের ব্যবধান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাদের কণ্ঠ হইতে মহাতেজে ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। আবার লুপ্তপ্রায় পিতৃ পিতামহগণের সুখময় স্মৃতি—তাঁহাদের অতুল্য গৌরব আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল।

চারিদিকে কেন এত আনন্দ কোলাহল। প্রাভাতিক স্নিগ্ধ সমীরণ সুমঙ্গল বার্ত্তা বহন করিয়া কেন আজ দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছে। কিসের জন্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিমল কুসুম স্তবকে স্তবকে হৃদয়-থালে সুসজ্জিত হইতেছে। দীপ ধূপ চন্দনের বিমল উচ্ছ্বাস ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করিবার জন্য কেন লালায়িত হইতেছে। আজ কি সেই মাঘের একাদশ দিবস! সেই পুণ্য মুহূর্ত্ত এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতে কি আবার ফিরিয়া আসিল! এই কি সেই অমৃত বেলা, যে শুভক্ষণে আমাদের প্রাচীন গৌরবের সামগ্রী ঋষিগণপরিসেবিত ব্রহ্মজ্ঞান—একেশ্বরবাদ এদেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। এই কি সেই শুভযোগ যে দিনে সেই অনন্তের উপাসনার জন্য এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ঈশ্বরের করুণা দিবানিশি আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইলেও, আজিকার দিনে তাঁহার বিশেষ করুণার নিদর্শন স্বরূপ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসূত হইয়াছিল; তাই আমাদের এত আনন্দ, এই উৎসব আয়োজন। দেবতারা আপনাদিগকে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত জানিয়া নিয়তকাল ঈশ্বরের অমৃতরস পান করিতেছেন, আমরা আমাদের আশা ও অধিকার প্রশস্ত করিয়া সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং দেববৃন্দকে ভ্রাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতেছি, তাই এত উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি।

আর্য্যকুলদেবতা আজ এখানে তাঁহার উদার সদাব্রত প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এস পাপী তাপী সাধু অসাধু, আজ পরমপিতা নিজহস্তে তোমার অন্তরের কালিমা ধৌত করিয়া দিবেন, তোমার হৃদয়ের ক্ষত স্থানে মৃতসঞ্জীবন ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, মুক্ত হস্তে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। প্রাতঃসূর্য্যের মহিমান্বিত গৌরবের মধ্যে অবস্থান করিয়া আজ তাঁহার বিশ্ববিজয়ী

মৃদু মধুর আহ্বান শান্তপ্রাণে শ্রবণ কর, তিনি ত্রিভুবন উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উত্থান কর জাগ্রত হও, আমার নিকট আইস আমি তোমার ভয় ব্যাকুলতার পরিহার করিব, এখন স্নেহময় পিতা করুণাময়ী মাতার সকরুণ আহ্বানে কি আমাদের অন্তর্দেশ বিগলিত হইবে না, দেখ তিনি তাঁহার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অমৃতধামের যাত্রী কে কোথায় আছ প্রস্তুত হও, এই পবিত্র দিনে মহা মহোৎসাহে প্রাচীন বেদমন্ত্রে সেই পরমারাধ্য পরমদেবের পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরমমঙ্গল চরম কল্যাণ লাভ কর। তিনি আমাদের সম্মুখে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া দেবপ্রসাদ—অনন্ত জীবনের সম্বল ও পাথেয় তাঁহার নিকট প্রচুররূপে ভিক্ষা কর। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

যেখানে প্রবেশ মাত্রে আমরা সংসারের সমস্ত পাপতাপ দুঃখ শোক ভুলিয়া যাই—দেশের দুর্গতি ভুলিয়া যাই—মর্ত্ত্যবাসীদিগের ক্রন্দন কোলাহল ভুলিয়া যাই, যেখানে ব্রহ্ম নাম হৃদয় হইতে আকাশে উত্থিত হয় এবং আকাশ হইতে স্বর্গীয় ব্রহ্মরসামৃত হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যেখানকার সুবিমল আনন্দ-সমীরণে অন্তর-মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া জগতের করুণাময় জনক জননী আমাদের তৃষিত অন্তঃকরণে অমৃতবারি বর্ষণ করেন—আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের সেই পুরাতন মন্দির নূতন সংস্কৃত হইয়া নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে; কত ঝঞ্ঝা ঝটিকার মধ্যে এই মন্দির অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়া আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় অমৃত নিকেতন দেখাইয়া দিতেছে; মাতার ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া পরম পিতার সন্নিধানে উপনীত করিয়া দিতেছে;—সেই পরমারাধ্য মঙ্গলময় পিতার সন্নিধানে উপনীত করিয়া দিতেছে যাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের আত্মা সংসার দুর্দ্দিনের মহা মহা তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া শান্তির নিরাপদ কূলে উত্তীর্ণ হয় এবং সেখান হইতে নবোদ্যমের সহিত নব নব মঙ্গলের পথে যাত্রা করে। আজ আমরা এই নূতন সংস্কৃত মন্দিরে, নূতন আনন্দে নব-প্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুমে পরমদেবতা পরমাত্মার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে নূতন সংস্কৃত হইয়া পুণ্যশ্রীতে শোভমান হইতেছি—আজ আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে। এই মন্দিরের সোপান আমাদের নিকটে অমৃত নিকেতনের সোপান—ইহার প্রত্যেক স্তম্ভ আমাদের নিকটে ভগবদ্ভক্তির অটল আশ্রয়-স্তম্ভ—ইহার বেদী আমাদের নিকটে হিমালয়ের মহোচ্চ শিখর। এইখান হইতে আমরা আমাদের পুরাতন ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি রাজর্ষিদিগের ব্রহ্মগাথা শুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করি। হে পরমাত্মন্! আমাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা এবং শান্তিদাতা পিতামাতা সুহৃৎ! এই উৎসবের দিনে তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর। আমরা পাপে মলিন, তাপে তপ্ত, রোগে আতুর শোকে কাতর, তুমি আমাদিগকে হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিতেছ তাই আমরা তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি—তোমার সুবিমল প্রসাদ বারিতে আমাদের সমস্ত মলিনতা মোচন করিয়া আমাদিগকে নবীভূত কর—যাহাতে আমরা তোমার প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া সংসারের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি, আমাদের প্রতি সেইরূপ প্রসাদবারি বর্ষণ কর, এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

পরমাত্মন্! সম্বৎসর কাল পরে আবার আমরা তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান। কি বলিয়া আজ প্রার্থনা করিব ভাবিয়া আকুল! তুমি যে তোমার অসীম করুণার স্রোতে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখিয়াছ। বিশ্বব্যাপিনী তোমার দয়ার কথা স্মরণ করিতে গিয়া যে বাক্য স্তব্ধ হইয়া যায়, কৃতজ্ঞতা নীরে যে চক্ষু অন্ধ হইয়া আইসে? ধরণীর সুখ সৌভাগ্য তুমি ত মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছ, আমরা সম্ভোগ করিতে জানি না, তাই তোমার দয়াময় নামের কলঙ্ক ঘোষণা করি। তুমি আমাদিগকে সংযত কর, আমাদের জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, প্রীতিকে চরিতার্থ কর। তুমি যে জগতের অন্তরালে বসিয়া আমাদের সুখসজ্জা রচনা করিতেছ, তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছে। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা মোহান্ধ জীব, সাধ্য নাই যে সংসার-যবনিকা ভেদ করিয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে তোমাকে দেখিতে পাই। "অন্ধ জনে দেহ আলো"। মৃত্যুর প্রতিকৃতি এই জড়জগতের কুটিল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চেতনা হারাইয়াছি, "মৃত জনে দেহ প্রাণ"। সংসার ধন্দায় ঘুরিয়া মরিতেছি, জীবন কাটিয়া যায়, তুমি স্বপ্রকাশ "আবিরাবিঃ" তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। চাতকের ন্যায় শুষ্ককণ্ঠে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আত্মার পিপাসা শান্তি কর। তোমাকে ভুলিয়া কতকাল—আর কতকাল অনিত্য সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীর ক্ষতিলাভ গণনায় শোক তাপের মর্ম্মযাতনায় মুহ্যমান হইয়া থাকিব। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যে অব্যক্ত ওঙ্কার ধ্বনি নিয়ত তোমার চরণের দিকে উত্থিত হইতেছে, তাহার সহিত কি আমাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইতে পারিব না। আর্য্যঋষিগণ তোমার যে বিস্ময়জনন প্রেমমুখ অবলোকন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলেন"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" দেবমনুষ্য তোমরা সকলে শ্রবণ কর আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি,তুমি তোমার সেই মোহন মূর্ত্তি আমাদের নিকট প্রকাশ কর, তোমাকে একবার হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া লই যে সংসার মোহ রজনীর সকল অন্ধকার অবসারিত হউক? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই ভিক্ষা দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রাত্রিকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইলে শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব বেদমন্ত্রে শান্তিপাঠ করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন।

প্রেমার্ণবং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং,
সেব্যং সদা সুরনরৈঃ শুভদং বিশুদ্ধং।

সর্ব্বেশ্বরং সকলবিঘ্নবিপত্তিনাশং,
সংসারতাপবিকলঃ শরণং প্রপদ্যে। ১ ॥
আনন্দরূপ ইতি যঃ প্রথিতঃ সুশাস্ত্রে,
দীনার্ত্তিহোঽমৃতময়ঃ পরিপূর্ণরূপঃ।
মাঘোৎসবে সততমুৎসবদঃ কৃপালুঃ,
অন্তর্বহিঃ স্ফুরতু নঃ কৃপয়াধমানাং ॥ ২ ॥
মাঘোৎসবে ব্যসননাশন দীনবন্ধো,
ত্বামেব নাথ প্রণতা মুহুরাহ্বয়ামঃ।
পাপান্ধকারমপগচ্ছতি তে প্রকাশাৎ,
নিত্যং সুখং স্ফুরতি দেব তবপ্রসাদাৎ ॥ ৩ ॥

অনন্তর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন।

ভারতে আজ একি অভিনব দৃশ্য। আর্য্যজাতির আরক্তিম সৌভাগ্য গগনের প্রথম দিবালোকে ললিত ভৈরবীর যে মধুর তান উত্থিত হইয়াছিল, নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ সূর্য্যকিরণে তাহার আবার পুনরভিনয় কেন। আর্য্যজাতির ত সকলই গিয়াছে, তাঁহাদের সেই পুরাতন বিজয় ভেরী বাজাইয়া আমাদের ফল কি। পদ্মার ঘোর আবর্ত্তের ন্যায় কালচক্র বিঘূর্ণিত হইয়া ভারতের অতুল্য বৈভব সকলই আপনার কুটীরের ভিতর টানিয়া লইয়া রাখিয়াছে কি? একবার অন্বেষণ করিয়া দেখ দেখি এই মহা শ্মশানের চিতাভস্মের ভিতরে যদি কিছু নিদর্শন পূর্ব্বাবস্থার না হউক অন্ততঃ বিকৃতাবস্থার থাকিয়াও প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। কই কিছুই নাই, তবে আছে এক ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা। সেই পুরাতন বলবীর্য্য নাই, সে ধ্যান ধারণা নাই, সে শক্তি সামর্থ্য নাই, উপনিষদের সে গুরু গম্ভীর ভাব নাই। আছে মাত্র বৈদিক কঙ্কাল আর দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ধারণার উপযোগী রসরঞ্জমা—কল্পনার আধিক্য ও আড়ম্বর বহুলতা।

পূর্ব্বের সে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব চলিয়া গিয়াছে। আছে তাহার ছায়া। বাহিরের নির্ম্মোক পড়িয়া রহিয়াছে, অন্তঃসার বহুদিন অন্তর্হিত। তাই ব্রাহ্মণকুমার ব্রহ্মচর্য্য লইয়া ব্যাপক কাল ধরিয়া গুরুগৃহে বাস করে না, একদিনেই তাহার উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন ফুরাইয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা নিজে ভিখারী হইয়াও নীতি ও ধর্ম্মের মহাবলে সমগ্র জনসমাজ পরিচালিত করিতেন, এক্ষণে তাহা তাঁহাদের শূন্য অভিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে আছে আর্য্যজাতির বিশুদ্ধ শোনিত, যাহা সমগ্র জগতে অতুলনীয়। আর আছে প্রাচীনত্বের উপর মমতা। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহ প্রাচীন ঋষিগণের সহিত আমরা এখনও যে এই সকল ক্ষীণ যোগসূত্রে আলম্বিত যে দিন তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে সে দিন আমরা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইব, এ দীন হীন পরাধীন জাতির অস্তিত্ব আর খুজিয়া মিলিবে না।

আজ আমরা এখানে প্রাচীন ভারতের অতুল্য গৌরব ঘোষণা করিতে আসি নাই, সেই শূন্য রোদনে আমাদের ফল কি। তাঁহাদের উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, পিতৃগৌরব স্মরণ করিয়া, আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের সোপানপরম্পরায় পদনিক্ষেপ কর। আর্য্যজাতির বিপুল সুখ সৌভাগ্যের সময় যে বিজয়সঙ্গীত হিমালয়ের গিরিকন্দর কাঁপাইয়া বিজন প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইত, উপনিষদের ছিন্ন পত্র হইতে সেই সঙ্গীত আবার গান কর যে, এই অকাল বোধনে আর্য্যজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আসন টলিয়া উঠুক। ওঙ্কার মহামন্ত্রের বিজয় নিশান পূর্ব্ব পিতৃপিতামহগণের সাধনালব্ধ অক্ষয় ধন, যাহার নিকট শত্রুর মহাতেজও বিকুণ্ঠিত তাহা একবার গগনে

উড়াইয়া দাও যে ভারতের দুর্ব্বল নরনারী কালব্যাপী জড়তা অপসারিত করিয়া দলে দলে আসিয়া তাহার নিম্নে সমবেত হউক। অমূর্ত্ত ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা করিতে আসিয়াছ, একবার সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং মন্ত্র উচ্চারণ কর যে এই মৃত সঞ্জীবন মহৌষধে নূতন প্রাণের সঞ্চার হউক। ঈশ্বরকে এখানে প্রত্যক্ষ জানিয়া সহস্র কণ্ঠে তাঁহার উপাসনা কর যে এই শান্তি স্বস্ত্যয়নে ভারতের প্রাচীন গৌরব আধ্যাত্মিক অজেয় বল ফিরিয়া আসুক। এই সাম্বৎসরিক মহামহোৎসবের দিনে তাঁহার মহিমা গান কর যে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দিনের অবসান হউক।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

অদ্য সেই আনন্দের দিন উপস্থিত যে দিনে মঙ্গলময় পরম পিতা পরম মাতা এবং পরম সুহৃদের আশীর্ব্বাদময় হস্ত আমাদের দেশের মস্তকের উপরে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কেমন আশ্চর্য্য রূপে মহাত্মা রামমোহন রায় চতুর্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলগত অপৌত্তলিক ভাব সর্ব্বসমক্ষে অনাবৃত করিলেন; তাহার পরে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সেই বীজ অঙ্কুরিত শাখায়িত এবং পল্লবিত হইল; তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ঈশ্বরের জাজ্বল্যমান স্নেহ এবং করুণা দেখিয়া আমাদের শরীর লোমাঞ্চিত হয়। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি শ্রেয়ের অনেক বিঘ্ন কিন্তু করুণাময় বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সেই মঙ্গলময় জনকজননীর আশীর্ব্বাদে আমরা শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কূলে উপনীত হইব—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব ভয় নাই—সত্যের জয়ধ্বনি, শুভকার্য্যের মঙ্গলধ্বনি, আনন্দের গীতধ্বনি একতানে গগনতল বিকম্পিত করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে অমৃতবারি বর্ষণ করুক। আমাদের মধ্যস্থলে থাকিয়া যিনি আমাদের নেতা—আমাদের নিকটে থাকিয়া যিনি অভয়দাতা—আমাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি শুভ বুদ্ধির প্রেরয়িতা—তিনিই আমাদের উৎসবের অধিদেবতা—আজ আমাদের আনন্দের সীমা কি!

আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শাখা বিস্তার যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে; আর, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যত কিছু আয়োজনের প্রয়োজন সমস্তই আমাদের চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলগ্রন্থে পরব্রহ্মের প্রতিপাদক প্রাচীন ঋষিবাক্য সকল বেদবেদান্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে; স্মৃতিপুরাণতন্ত্র হইতে সার সার ধর্ম্মোপদেশ সঙ্গৃহীত হইয়া অধ্যায়পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অপৌত্তলিক ক্রিয়াকাণ্ডের শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমাদের যখন যাহা চাই তাহা আমরা হাত বাড়াইলেই পাইতে পারি—আমাদের এখন ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, কেবল যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবারই অপেক্ষা। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পথে সুধীরে পদ নিক্ষেপ করা—ইহাই এখন আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। এই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের ফল ফলিবার সময় উপস্থিত হইলে আমাদের দেশের তাপজর্জ্জরিত শরীরে

শান্তি সমীরণ বহমান হইবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত; কিন্তু এখন আমাদের কেবল এইটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সুখশান্তির সুবাতাস মঙ্গলময় পরমেশ্বরের হস্তে—কর্ত্তব্য-সাধনের দাঁড় এবং হাল আমাদের আপনাদের হস্তে। বায়ু যেমনই বহুক্ না কেন—যে দিকেই বহুক্ না কেন, কাণ্ডারীগণকে কূলের দিকে নৌকার মুখ ফিরাইয়া দৃঢ়রূপে হাল ধরিয়া থাকিতেই হইবে—এবং দাঁড়িদিগকে দাঁড় টানিতেই হইবে,তাহাতে শৈথিল্য করিলে চলিবে না। একই সময়ে দুইদিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে—এক দিকে ঈশ্বরের দান, আর এক দিকে আমাদের নিজের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের দান ঈশ্বরের হস্তে—আমাদের নিজের কর্ত্তব্য আমাদের নিজের হস্তে। সকল-কার্য্যেরই অভ্যন্তরে ঐরূপ দুই হস্তের যুগপৎ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন যে সামান্য কার্য্য বস্তুদর্শন তাহারও অভ্যন্তরে আমার দুই হস্ত যুগপৎ কার্য্য করিতেছে;—চক্ষুরুন্মীলন করা আমাদের আপনাদের হাত এবং সূর্য্যালোক প্রেরণ করা ঈশ্বরের হাত। আমরা সাধক, ঈশ্বর সিদ্ধিদাতা বিধাতা। সাধন আমাদের হস্তে—সিদ্ধি ঈশ্বরের হস্তে।

বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের ন্যায় এবং করুণার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যদি কর্ত্তব্য-সাধনে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হই, তবে সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষ অবশ্যই আমাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিবেন। কিন্তু সে সিদ্ধি যে কিরূপ তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে অধিকারীও নহি—অনুমান করিতে ইচ্ছাও করি না। আমরা কেবল এইটি জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সাধন করিলে, ঈশ্বর যাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করিবেন তাহাই আমাদের একমাত্র মঙ্গল। যদি সুখী হইতে ইচ্ছা কর তবে সুখের জন্য লালায়িত হইও না; কর্ত্তব্য-কার্য্য প্রাণপণে সাধন কর—উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে এরূপ পরমাশ্চর্য্য সুখশান্তি বর্ষণ করিবেন যে তোমার অন্তঃকরণ আনন্দের আলয় হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্ জ্ঞানময় প্রেমময় করুণাময় মাতা পিতা এবং সুহৃদের হস্তে আমাদের চিরন্তন সুখসমৃদ্ধি গচ্ছিত রহিয়াছে—তাহার জন্য কোনো চিন্তা নাই—কোনো ভাবনা নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ অবলম্বন করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য; তাহাতে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে এবং কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এই প্রার্থনা করিলেন।

হে ত্রিভুবননাথ! "আমি আজি কেন
হেরি চারিদিক সুধাময়।
তোমার শুভ আগমনে, হৃদয় কাননে
ফুটল প্রীতির কুসুম নিচয়" ॥

আজ আনন্দের সীমা কি! যে আনন্দ হইতে এই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, সেই আনন্দ-সুধা পান করিবার জন্যই অদ্যকার এই মহোৎসব। যার যেমন তৃষ্ণা তুমি আজি তেমনি করিয়াই তাহাকে তোমার প্রেম-সুধা পান করাইতেছ। যিনি ভক্তি-চক্ষে বিশ্বাস-চক্ষে এই উৎসব-ক্ষেত্র দেখিতেছেন, তুমি আজি তাঁহাকে সংসারাতীত শোভাই দেখাইতেছ। যে শোভা নবোদিত সূর্য্যে নাই, শরতের পূর্ণ চন্দ্রে নাই, গঙ্গা-বক্ষে

পতিত জ্যোৎস্নায় নাই, আকাশে নাই, অন্তরীক্ষে নাই,কুসুমে নাই,কোথাও নাই, সেই অতুল শোভাই, এই ব্রহ্মোৎসব হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। এ শোভা তোমারই। আত্মার মধ্য দিয়াই এ শোভা বিনির্গত হইতেছে। একটি আত্মা নয়, দুইটি নয়, শত শত আত্মারূপ পদ্ম আজি তোমার কিরণস্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া আমি আকুল হইয়া গাইতেছি;

"প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলং"।

তোমার প্রেমরূপের জ্যোতি আজ ক্ষণকালের জন্য এখানে পড়িয়াছে, তাহাতেই এ উৎসব-ক্ষেত্র এখন তপোবনের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। আজি আমরা পুনর্ব্বার সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" ভক্তিভরে কীর্ত্তন করিতেছি। হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুৎসিত ভাব সকল আজি এখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। তুমি এখন মধ্যে; আর আমরা তোমার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তোমার পূজা করিতেছি। আজি ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, পাপ সকল বিকম্পিত হইয়া, আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তোমার সুন্দর কোমল ভাব দেখিয়া আমরা আজি শান্তিরসে নিমগ্ন হইতেছি। এত উৎসাহ—এত স্তবস্তুতি—এত আনন্দের মধ্যে আমরা আজি তোমার নিকটে বলিতেছি, এই শান্তি-সুখ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে চিরস্থায়ী কর। এই উৎসব-ক্ষেত্রের আলোক ক্ষণকাল পরেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু নাথ! প্রার্থনা করি আমাদের এই আনন্দালোক যেন নিমেষ মধ্যে নিবিয়া না যায়। ইহার স্নিগ্ধালোকে আমরা যেন চিরদিন পুলকিত হইতে পারি। দেখ নাথ! তোমার পূজার অভাবে, আমাদের হৃদয়, আমাদের সংসার, আমাদের দেশ কত সময়ে কি অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই অন্ধকার হইতে উদ্ধার কর। আমরা তোমার মঙ্গলভাবের অনুকরণ করি না বলিয়াই এ দুঃখের সংসার আরো ঘোরতর দুঃখের আধার হইয়াছে। এখানে এক জন আর এক জনকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসে না, এখানে সকলে সকল সময়ে তোমায় ভক্তিফুলে পূজা করে না। তাই এ সংসার সুখের সংসার নয়, দুঃখের সংসার। তুমি ইহার দুর্গতি পরিহার কর। তুমি তোমার সংসারকে রক্ষা কর। তুমি এখানে এমন করিয়া তোমার প্রেমের আলো জ্বাল, যাহাতে এখানকার দ্বেষ হিংসা ও অশান্তি দূর হইয়া যায়। আমরা তোমার প্রেমের ভিখারি। তোমার প্রেমের মধ্যে আনিয়া আমাদের সন্তাপাশ্রু মার্জ্জনা কর। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। তুমি আমাদিগকে দর্শন দাও, তোমার সহবাসসুখে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর। সংসার-মরীচিকায় বার বার প্রতারিত হইয়া শুষ্ককণ্ঠ হইয়াছি। তোমার শান্তি-সমুদ্রের নিকটে লইয়া চল, তাহাতে স্নান ও তাহার জল পান করিয়া সকল পাপ সকল তাপ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। সেই স্বর্গীয় বারিতে স্নাত হইয়া চিরদিন তোমার পূজা ও স্বর্গীয় উৎসব ভোগ করিবার শক্তি আমাদিগকে দাও।

নাথ! নিমেষে নিমেষে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমার উৎসবানন্দ ভোগ করিবার

আশা তোমার চরণে রাখি। তুমি আমাদিগকে সে আশায় বঞ্চিত করিও না। যতক্ষণ আমরা এখানে থাকিব তোমার আনন্দের মধ্যেই আমাদিগকে রাখিও। যেন নিমেষ মাত্র তোমার আনন্দে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে না হয়। যখন জন্মের মত দুই চক্ষু মুদিত করিব সে অন্ধকারে তুমি জ্যোতির্ম্ময় রূপে দেখা দিও। তোমার অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়া তোমার চিরানন্দ স্বরূপে চিরমগ্ন রাখিও। আর যেন কখন নিরানন্দে থাকিতে না হয়। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা। তুমি কৃপা করিয়া ইহা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদগান।

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায॥ ১॥

হে দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর। আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ১॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ॥
সংপ্রাপ্যৈনমৃষযোজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা-
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায॥ ২॥

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য; তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই। ঋষিরা ইহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, আত্মার উন্নতি লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশান্তচিত্ত হয়েন। সেই যুক্তাত্মা ধীরেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন। সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ২॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণাভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদযতে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ॥
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায॥ ৩॥

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত-সকল যাঁহাতে স্থিতি করে; সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন। সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ৩॥

যশ্চাযমস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃত-
ময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
যশ্চাযমস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃত-
ময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায॥ ৪॥

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ৪॥

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল সুরফাঁকতাল।

সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল
সমুদিত প্রেমচন্দ্র অন্তর পুলকাকুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণা ধ্বনি।
অচল বিরাজ করে

শশীতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে
ত্রিভুবনেশ্বর,
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,
জয় জয় গীত গাহে সুরনর।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল একতালা।

শীতল তব পদ ছায়া, তাপ হরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেম মুখ
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত;
তব চরণ কমল রতন রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
মর্ম্ম মাঝারে শল্য বরষে
তবু প্রাণ মন পীযূষ পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম পরাণ বল্লভ
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার, তব
সকরুণ করপল্লব।
নাথ যার যাহা আছে তার তাই থাক্
আমি থাকি চির লাঞ্ছিত,
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাক থাক চির বাঞ্ছিত।

রাগিণী হাম্বীর—তাল তেওরা।

আর কত দূরে আছে সে আনন্দ ধাম,
আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ আমি পথ নাহি জানি।
রবি যায় অস্তাচলে, আঁধারে ঢাকে ধরণী,
কর কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননি॥
অতৃপ্ত বাসনা লাগি, ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা বৃথা মেলা বৃথা বেলা গেল বহে,
আজি সন্ধ্যা সমীরণে,লহ শান্তি নিকেতনে,
স্নেহ কর পরশনে,চির শান্তি দেহ আনি॥

রাগিণী বাহার—তাল চৌতাল।

আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশি দিন সুখে শোকে,
সেই চির আনন্দ, বিমল চির সুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ।
পরা শান্তি পরম প্রেম,
পরা মুক্তি পরম ক্ষেম
সেই অন্তরতম চির সুন্দর প্রভু চিত্ত সখা,
ধর্ম্মঅর্থকামভরণরাজা, হৃদয় হরণ।

রাগিণী হাম্বীর—তাল ধামার।

হরষে জাগো আজি,জাগোরে তাঁহার সাথে
প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী।
গগনে গগনে হের দিব্য নয়নে, কোন্
মহাপুরুষ জাগে মহা যোগাসনে,
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

এ কি করুণা করুণাময়
হৃদয় শত দল উঠিল ফুটি
বিমল কিরণে তব পদ তলে।
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে
লোকে লোকে লোকান্তরে আঁধারে
আলোকে
সুখে দুখে হেরিনু হে।
স্নেহপ্রেমে জগতময় চিত্তময়।

রাগিণী দেশ—তাল একাতালা।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও
আমায় আনন্দে ভাসাও।
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে
জাগাও।
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি পাথারে,
সব সুখ দুঃখ থামিয়া যাক্ হৃদয় মাঝারে,

সকল বাক্য সকল শব্দ সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ,
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও।

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামার।

আজি রাজ আসনে তোমারে
বসাইব হৃদয় মাঝারে।
সকল কামনা সঁপিব চরণে
অভিষেক উপহারে॥
তোমারে বিশ্বরাজ অন্তরে রাখিব
তোমারি ভকতের এই অভিমান।
ফিরিবে বাহিরে সর্ব্ব চরাচর,
তুমি চিত্ত আগারে।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

কে যায় অমৃত-ধাম-যাত্রী,
আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
কাঁপে নভ জয় গানে।
আনন্দরব শ্রবণে লাগে,
সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথ পানে।
ওগো রহ রহ মোরে ডাকি লহ,
কহ আশ্বাসবাণী;
যাব অহরহ সাথে সাথে,
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে,
অপরাজিত প্রাণে॥

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক। ১১ অগ্রহায়ণ বুধবার।

ঈশ্বরে বিশ্বাস।

কি অসহায় কি দুর্ব্বল সেই, যার ঈশ্বরে বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে। কি দুর্ভাগ্য সেই জীব যার তাঁর উপর নির্ভর নাই। 'সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোন মতে বিনা তাঁর সাধনা' এ সংসারে মনুষ্যের অবস্থা কি সংকটাপন্ন; প্রতিক্ষণেই তার অত্যন্ত দুঃখ দুর্ভাগ্য ঘটিতে পারে, সে সর্ব্বদাই বিপদে বেষ্টিত রহিয়াছে। সে অসংখ্য দৈব ঘটনায় অসুখী হইতে পারে, যে ঘটনা সে পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পায় না, দেখিতে পাইলেও তাহার প্রতিবিধান করিতে সে অক্ষম! এমন যার অবস্থা সে কি প্রকারে সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে—বাঁচিতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

কি সুখী সেই মনুষ্য যিনি যথার্থই ঈশ্বরকে আপনার আশ্রয়দাতা ও পিতা মাতা বলিয়া অন্তরে গাঢ়রূপে অনুভব করেন। যিনি তাঁহাকে তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন। যদি প্রলয়কাল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, যখন আকাশস্থ কোটি কোটি লোক পরস্পর সংঘর্ষ দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে থাকে, তখনও তিনি পতনশীল পৃথিবীর উপর নির্ভয়ে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করেন। ভয়ে সংশয়ে অবিশ্বাসীর মন যেমন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকে, তাঁর তেমন থাকে না। তিনি সদাই সুখী, সদাই প্রফুল্ল। তিনি জানেন পিতা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণই হস্ত প্রসারণ করিয়াই রহিয়াছেন। তিনি আপনাকে শক্তিহীন ও দূরদৃষ্টিবিহীন বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভয় হয় না, কারণ তিনি জানেন যে তাঁর পিতা সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্, তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁর আনন্দে আনন্দিত। প্রত্যেক দৈবশক্তিজনিত উপকার ও সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন। এই দৈবশক্তি প্রভাবে তিনি সকল প্রকার দুঃখ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হন, অথবা বীরোচিত সাহসের সহিত তাহা সহ্য করিতে পারেন। সে সহিষ্ণুতাতেও এক লোকাতীত আনন্দ তাঁর উদয় হইতে থাকে।

যাঁর বিশ্বাস যে তিনি তাঁর বলে বলী, তিনি নিজ শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য ও অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। আমি পুরাবৃত্ত হইতে এমন কত শত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি, যে যখনই সেনাপতিগণ ঈশ্বরের দোহাই দিয়া সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়াছেন,তখনই তাঁহারা যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়াছেন।

এই বিশ্বাস হইতেই মনুষ্যের ধৈর্য্য

আশা প্রফুল্লতা প্রভৃতি বিকসিত হয়, ইহারই বলে মনুষ্য সেই সকল দুঃখ দূর করিতে পারে, যাহা তাহার নিজ শক্তির অতীত। দারিদ্র্য ক্লেশে—শোকে বিশেষতঃ মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস, বিশেষরূপে ফলপ্রদ হয়। শেষ মুহূর্ত্তে যখন আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন এক জীবনের অবস্থা হইতে অন্য জীবনের অবস্থায় উপনীত হয়, যখন নূতন দৃশ্য, নূতন বস্তু, নূতন সঙ্গীদিগের নিকট উপস্থিত হয়, তখন এই বিশ্বাসই, ভয় ও ব্যাকুলতাকে আত্মা হইতে দূর করিয়া দেয়। কারণ বিশ্বাসী যিনি তিনি জানেন, যে তিনি ইহলোকেই থাকুন আর পরলোকেই থাকুন, তিনি তাঁর পরম মাতার ক্রোড়েই থাকিবেন। যে স্নেহ জীবনে, সেই স্নেহ মরণে; যে স্নেহ ইহলোকে সেই স্নেহ পরলোকে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যে দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহাকে এই অন্ধকার সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ করিবেন, তিনিই তাঁহাকে অনন্ত উন্নতির পথে আনন্দ লোক হইতে আনন্দ লোকে লইয়া গিয়া—ক্রমিকই তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন। এই বিশ্বাস মনুষ্যের সহজ। ইহার বীজ আত্মায় আছে। থাকিলে কি হয়, সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে ইহা সকল আত্মায় সমানরূপে প্রস্ফুটিত হয় না। সুতরাং যাহাতে এই দোষ না ঘটিতে পারে, বা ঘটিলে তাহার প্রতীকার হয়, এমন সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত।

এই সহজ বিশ্বাসের বল যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার উপায় সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথমতঃ যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতে বা তর্ক করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা কোন কালেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। তাঁহারা একবার ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাসের পক্ষপাতী হন, পুনর্ব্বার তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শীতল হইয়া যায়। অতএব যে পক্ষ নিরাপদ ও সম্ভবপর, সেই পক্ষে একবার মন বসিলে প্রতিকূল তর্ক মূলক গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয়। জ্যামিতি শিক্ষার সময় কোন প্রতিজ্ঞা বা প্রস্তাবের সত্যে যদি একবার বিশ্বাস হয়, আর পরে আমরা তাহার প্রমাণ ভুলিয়া যাই, তবুও যেমন তাহার সত্যে অবিশ্বাস হয় না, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় তর্ক-ঘটিত পুস্তক পাঠের সময়েও আমাদের ঐ নিয়ম মনে রাখা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মনীতির নিয়ম সকল শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পালন করিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান ঈশ্বরে বিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখে, আর ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্মকে বল ও জীবন দান করে। ইহারা উভয়ে উভয়ের জনয়িতা। অতএব আমরা যেন প্রাণপণে ধর্ম্মনীতির নিয়ম সকল প্রতিপালন করি।

আর এক উপায় ঈশ্বরের পূজা। ইহা বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিবার পক্ষে বড় অনুকূল। যেমন বাহিরের মন্দিরমধ্যে অদ্য আমরা পূজা করিতে আসিয়াছি, তেমনি হৃদয়-মন্দিরে অনুক্ষণ তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। এই অনুক্ষণ পূজা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা যিনি করেন, তিনিই বুঝিতে পারেন। তিনি হৃদয়ের দ্বার সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট খুলিয়া রাখেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর নিকট সকল কথাই অকপটে বলেন, তিনিও তেমনি বলিতে থাকেন, যেন তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। সকল কার্য্যের পরামর্শ তিনি তাঁর সঙ্গে করেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্টতা জন্মে, তিনি যেন তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র অন্তরনিহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে থাকেন।

তাঁহার বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নহে। তিনি জ্ঞানেতে যাহা লাভ করিয়াছেন, জীবনের ঘটনাবলীতে তাহা প্রত্যক্ষ করেন। প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁর অভাব ও দুঃখের কথা তাঁহাকে জানান। সে গোপন কথা আর কেহই জানিতে পারে না, হয়ত সে গোপন কথা আর কাহাকেও বলিবার নয়, ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাঁহার কথা শুনেন, ও তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করেন। তিনি কেমন গোপনে তাঁ-

হার করুণা অনুভব করেন। কেমন গোপনে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর চরণে অশ্রুবারি ঢালিয়া দেন, হায়! দেবতারাও তাহা দেখিতে স্পৃহান্বিত হন। বিশ্বাসীর নিকট ভগবান কত অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করেন, অন্ধ অবিশ্বাসী তাহার কি বুঝিবে?

শেষ উপায় নির্জ্জনে অবস্থান। ইহাই বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বড় বড় সহরের নানাবিধ বস্তু ও ব্যাপার, চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। মানুষ সেখানে আপনার জীবনের যাহা বিশেষ মঙ্গলজনক তাহা দেখিতে পায় না, বা দেখিতে পাইলেও আপনাকে তাহাতে নিযুক্ত রাখিতে পারে না; আমোদ-সমুদ্রে সেখানে নিয়তই তরঙ্গ উঠিতেছে; এবং পাপের দৃষ্টান্ত এত অধিক, যে লোক অনুক্ষণ তাহা দেখিয়া পাপকে আর পাপ বলিয়াই বুঝিতে পারে না; যেন তাহা করিবার, তাহাদের ন্যায় অনুসারে অধিকার আছে।

আবার নগর মধ্যে আমরা মনুষ্যের হস্তের কার্য্যই অধিকাংশ দেখিতে পাই। নগরপ্রান্তে নিভৃত প্রদেশে ঈশ্বরের কার্য্যই চতুর্দ্দিকে নয়নগোচর হয়। হরিৎবর্ণ ক্ষেত্র, পুষ্পশোভিত উদ্যান, নির্ম্মল বারিপূর্ণ পদ্ম ও হংসশোভিত সরোবর, রজতবসনাবৃত নদী, নীল সমুদ্র, অভ্রভেদী পর্ব্বত ও স্বভাবজাত কত প্রীতিকর বস্তু তথায় বিরাজ করে। ভগবান আপনার অস্তিত্ব সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় তথাকার প্রত্যেক পদার্থে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে কোন্ মনস্বী ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রেম উদ্দীপন না হয়? আকাশে ও পৃথিবীতে ভগবান আপনার অস্তিত্বের যুক্তি আপনিই রচনা করিয়াছেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন জনকোলাহল হইতে দূরে যান, তখন তিনি ঐ যুক্তির বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া থাকিতে পারেন না। অতএব স্বভাবের শোভা পরিপূরিত স্থানে বাস করাই বিশ্বাস ও ভক্তিকে জাগ্রত রাখিবার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

'এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজাইয়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত কোরে,
তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ॥
পত্র পুষ্প ফলে, দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় সে তোমার দয়াল নামটি লেখা।
সুন্দর নামটি তোমার, বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নামটি নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ তুল্য গগন মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল।
তার মাঝে ইন্দু, ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু নাম তায় অঙ্কিত করেছ॥
জলেতে লিখেছ জগৎ জীবন,
পবন হিল্লোলে, হয় দরশন।
জ্বলন্ত অক্ষরে, জলদ লিখন,
জ্যোতির্ম্ময় নামে জগৎ দেখাতেছ॥
ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে,
সর্ব্বব্যাপী নাম, লিখেছ স্বাক্ষরে।
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ॥
হৃদয়ে লিখেছ, হৃদয় বল্লভ,
প্রেম সূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব।
তন্নামে অঙ্কিত, তোমারি ত সব,
হাতে কলমেতে, তুমি ধরা যে পড়েছ'॥

হে শিব সুন্দর! তোমার শোভাময় জগৎ যেন আমাদিগকে তোমার প্রতি উন্নত করে। হে দেব! তোমার বলে আমাদিগকে তুমি বলীয়ান কর। তুমি আমাদিগকে, তোমার হস্তাবলম্বন দাও। তাহা না হইলে প্রতিক্ষণেই আমরা পড়িয়া মরি। তুমি সঙ্গের সঙ্গী হইয়া প্রতিক্ষণেই আমাদের কানে কানে বল, 'এই যে আমি তোমার সঙ্গে রহিয়াছি, তুমি কেন ভীত হও'।

হে অভয়দাতা দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়! আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে দেব! অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস তুমি আমাদিগকে দাও, যাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা ভবভয় হইতে মুক্ত হইয়া তোমার আনন্দে আনন্দিত হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৬৮॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২২১৭॥৶০
সমষ্টি	...	২৫৮৬।৶০
ব্যয়	..	৩১৭।৬
স্থিত	...	২২৬৯/৬

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	১৪৫৭৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
	১৯৫৭৯
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৩০৫৯
	২২৬৯/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১৲
পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্‌অয়ার হাউসের সেয়ারের ডিবিডেণ্ট মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১১৩৲
	২২৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫।৶১
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ঐ		৩৲
" " উপেন্দ্রনাথ কুমার, ঐ		১॥০
" " মহিমাচন্দ্র মজুমদার, রংপুর		৩।৶০
" " কালীনাথ চৌধুরী, চুঁচুড়া		৩৶০
" ভি, রায় ম্বয়ার, সন্দীপ		৩।৶০
		১৫।৶০
পুস্তকালয়	...	৸০
যন্ত্রালয়	... ...	১২৮৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশকের মূলধন		॥০
সমষ্টি		৩৬৮॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৯৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৯॥/৯
পুস্তকালয়	...	২০৶০
যন্ত্রালয়	...	৮৮।৯
সমষ্টি	...	৩১৭।৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

—

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮ই ফাল্গুন রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭॥ ঘটিকার সময় এবং অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হইবে। উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

চতুর্দ্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

১৮১৯ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৪। কলিগতাব্দ ৪৯৯৮। ৩ চৈত্র বুধবার।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্দ্দশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৬৪৫ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৬৪৬ সংখ্যা।

আষাঢ় ৬৪৭ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৬৪৮ সংখ্যা।

ভাদ্র ৬৪৯ সংখ্যা।

আশ্বিন ৬৫০ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ৬৫১ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৬৫২ সংখ্যা।

পৌষ ৬৫৩ সংখ্যা।

মাঘ ৬৫৪ সংখ্যা।

ফাল্গুন ৬৫৫ সংখ্যা।

চৈত্র ৬৫৬ সংখ্যা।

অকারাদি বর্ণক্রমে চতুর্দ্দশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৪০ সংখ্যা ১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২২ আশ্বিন বুধবার ১৮১৮ শক।

সংসার ও প্রার্থনা। *

সংসারে সমস্ত জ্ঞানই আপেক্ষিক। দুই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বে তবে আমাদের জ্ঞানের উদ্রেক হয়। ক্ষুদ্রের সহিত তুলনা করিলে তবে আমরা বৃহৎকে বৃহৎ বলিয়া জানিতে পারি; দুঃখের সহিত তুলনা করিলে তবে সুখকে সুখ বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হই। যদি পাপ না থাকিত, তবে আমাদিগের নিকট পুণ্যও থাকিত না, যদি মন্দকে না জানিতাম, তবে ভালকে ভাল বলিয়া জানিতাম না। এই দ্বন্দ্বই সংসার। ইহা ব্যতীত আমরা সংসারকে কোন মতে কল্পনাই করিতে পারি না। অতএব ঈশ্বর কেন যে সংসারকে দ্বিধার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা; কারণ অন্য কোনরূপ অবস্থা আমাদের অন্তঃকরণ চিন্তা করিতেই পারে না।

কেবল তাহাই নহে; আত্ম-সুখের, সমাজের, ধর্ম্মের যে সকল উচ্চ আদর্শ মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত, তাহা ও এই দ্বন্দ্বকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উন্নতির অর্থই নিম্ন হইতে উচ্চে অধিরোহণ;—যদি নিম্ন না থাকিত, তবে উন্নতি বলিয়া কোন কথা থাকিত না। বিনা চেষ্টায় অজ্ঞানভাবে উন্নত ভূমিতে পড়িয়া থাকা অপেক্ষা নিজের চেষ্টায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উচ্চ লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া উন্নতির পথে নিয়ত অগ্রসর হওয়াই মনুষ্যত্বের যথার্থ সাধনা। তাহাতে আত্মা বল প্রাপ্ত হয়, যাহা লাভ করিতে থাকে, প্রতি পদে তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে এবং উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতর উচ্চতর উন্নতির পথে ধাবমান হইবার অভ্যাস লাভ করিতে থাকে। আমাদের জ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধেও একথা খাটে। বিজ্ঞানের বিশেষ কোন সত্য অনায়াসে মুখস্থ করিয়া লাভ করায় মানুষের সেরূপ গৌরব নাই, কিন্তু নিজে সেই সত্যের পথ সন্ধান করিয়া লাভ করাই যথার্থ শিক্ষা। বৈপরীত্যের এই দ্বন্দ্বে ভাল মন্দের এই সংঘর্ষে সংসার-

* শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব কর্ত্তৃক পঠিত।

সমুদ্র হইতে মহান্ মানব-হৃদয়-সিন্ধু হইতে মহত্ত্ব উন্মথিত হইয়া উঠিতে থাকে। যাহা ভাল, তাহা সহজ নহে, তাহা সুলভ নহে, যাহা শ্রেয়ঃ তাহা কঠিন সাধনা-সাধ্য,—যদি তাহা অনায়াস-লভ্য হইত, তবে তদ্দ্বারা আমাদের মনুষ্যত্বের—আমাদের আধ্যাত্মিকতার চর্চ্চা হইত না, তবে তাহা পাইতাম মাত্র, কিন্তু পাইবার চেষ্টায় যে বল—যে মঙ্গল লাভ হয়, তাহা আমাদের হইত না। বৃক্ষলতা যেমন জড়বৎ ভাবে পত্র পুষ্প ফল লাভ করে, আমরাও তেমনি নিশ্চেতন-ভাবে যাহা ভাল তাহা পাইতাম। তেমন সহজে লাভ করিলে শ্রেয়ঃ শব্দের কোন সার্থকতাই থাকে না। যাহা প্রেয় তাহা মনোরম। আমাদের প্রকৃতি তৎপ্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। যাহা শ্রেয়ঃ তাহা দুরূহ—দুর্গম; প্রেয়ের মোহ অতিক্রম করিয়া তাহার অভিমুখে মনকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে হয়। শ্রেয়ের সেই কাঠিন্যের একটি গৌরব আছে; কারণ সে শ্রেয় বলিয়াই আমাদের মঙ্গল বিধান করে এবং কঠিন দুঃসাধ্য বলিয়াই আমাদিগকে বল দেয়, স্বাস্থ্য দেয় এবং সুগভীর আনন্দ দেয়; কারণ কঠিন সাধনায় আত্মা আপন ক্ষমতা অনুভব করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, প্রবৃত্তির সুখ-স্রোতে অনায়াসে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সে আনন্দ পায় না, বরং গ্লানি অনুভব করিতে থাকে। প্রেয় যখন শ্রেয় হইতে আত্মাকে দূরে টানিয়া লইয়া যায়, মন যখন দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবাধ্য হয়, শরীর যখন বিকল যন্ত্রের ন্যায় অসংযত হইয়া উঠে; আপাত সুখের প্রমত্ততা যখন চারিদিকে নৃত্য করিতে থাকে, তখন বাহিরে প্রমোদের উল্লাস কলধ্বনি যতই উচ্ছ্বসিত হইতে থাক্, আত্মা আপন সাম্রাজ্যমধ্যে আপনার এই পরাভব,—এই অরাজকতা অনুভব করিয়া অন্তরে অন্তরে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। যে আত্মা একান্ত দুর্ব্বল, সে ক্রমশঃ অচেতন হইয়া সকল প্রকার বেদনা ও শোক বিস্মৃত হয়। যে আত্মা অপেক্ষাকৃত বলবান, থাকিয়া থাকিয়া দিনে নিশীথে সমস্ত প্রমোদ কোলাহলের ঊর্দ্ধে তাহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥"

পথ অতি দুর্গম, তাহা ক্ষুরধারার ন্যায় শাণিত, অতএব সে পথ আশ্রয় করিতে হইলে, নিতান্ত অবহেলায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে চলিবে না;—আলস্যভরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে স্খলিত হইতে হইবে। উঠিতে হইবে, জাগ্রত হইতে হইবে; আত্মার পক্ষে সেই জাগরণ একান্ত আবশ্যক। শ্রেয়ঃ পথে যন্ত্রের মত চলা নহে, জাগ্রত ভাবে চলা আবশ্যক; নতুবা আত্মার কর্ত্তৃত্ব থাকে না, বল থাকে না, আত্মার আত্মত্ব চলিয়া যায়। এই জন্য শ্রেয়ের কাঠিন্যই আত্মার পক্ষে বিশেষরূপে কল্যাণকর। শ্রেয়ের কাঠিন্য আর এক কারণে আত্মার পক্ষে কল্যাণকর;—একদিকে তাহা আত্মার আত্ম-কর্ত্তৃত্ব উদ্বোধিত করিয়া তোলে, অপর দিকে সর্ব্ববলদাতা সর্ব্বফলদাতা পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব সুদৃঢ় করিয়া দেয়; কারণ আমাদের শরীর মনের অভাব পৃথিবীতে নানারূপে বিদূরিত হয়; আমি যদি দুর্ব্বল হই, রাজা আমার বল আছেন, আমি যদি অজ্ঞ হই, পণ্ডিতের নিকট আমি জ্ঞানলাভ করিতে পারি, আমি যদি দরিদ্র হই, ধনীর দ্বারে আমি ধনপ্রার্থনা করিতে পারি; কিন্তু আত্মা যখন প্রেয়ের কুহক হইতে আপনাকে

বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রেয়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহে, অথচ যখন বাহিরের প্রলোভন এবং তাহার মুগ্ধ দেহ মন পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তখন সে আপন দুর্গতি বুঝিতে পারে, অথচ প্রতীকার করিতে পারে না, তখন ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হওয়া ব্যতীত তাহার অন্য কোন গতি নাই। আত্মার অভাব পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহ মোচন করিতে পারে না। আমাদের শরীরের প্রভু রাজা, আমাদের মনের প্রভু মনস্বী পণ্ডিত, কিন্তু আমাদের আত্মার প্রভু একমাত্র পরমাত্মা। অতএব "য আত্মদা বলদা" যিনি আত্মদাতা—বলদাতা, তাঁহার নিকট কি ধন-রত্ন-সুখ-সম্পৎ প্রার্থনা করিব? সে কি এতই দুর্লভ—এতই অভিলষিত যে,—

"য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্বে উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ, যস্য ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ।"

যিনি আত্মদাতা—বলদাতা, বিশ্ব যাঁহার উপাসনা করে, দেবগণ যাঁহার আদেশ বহন করে, অমৃত এবং মৃত্যু যাঁহার ছায়া, তাঁহার নিকটে তাহা প্রার্থনা করিতে যাইব? তবে তাঁহার নিকটে কি প্রার্থনা করিব? এই প্রার্থনা করিব যে,

"অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা ঽমৃতং গময়"

হে পরমাত্মন্! আমরা দ্বিধার মধ্যে আছি, আমরা শ্রেয় এবং প্রেয়ের মধ্য স্থলে আন্দোলিত হইতেছি; অতএব তুমি আমাকে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও; সে তোমার কৃপা ব্যতীত হইবে না। সে সত্য লোক—সে জ্যোতির্লোক—সেই অমৃত লোক একমাত্র তোমারই; সে কোন পার্থিব রাজার নহে, কোন জ্ঞানীর নহে, গুণীর নহে। "আবিরাবী র্ম্ম এধি" হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। তুমি আপনি ছাড়া, তোমাকে আর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না।

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ"

তোমাকে যখন আত্মার মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে চাহিতেছি, তখন সে একমাত্র তোমারই প্রসাদ ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না।

"রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"

হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। যখন আমি অসত্যে আছি, অন্ধকারে আছি, মৃত্যুর মধ্যে আছি, তখনই তোমাকে রুদ্র রূপে দেখিতে পাই; তোমার সেই রুদ্র মুখ আমি সহ্য করিতে পারি না। আমাকে সত্যে—আলোকে অমৃতে লইয়া যাও! আমি তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি; ধন্য—কৃতার্থ হই! তোমার নিকটে আমি আর কোন অভাব জানাইব না, আর কোন প্রার্থনা করিব না, যখন অন্তরে তোমার অভাব অনুভব করিব, তখনি তোমাকে ডাকিব; যখন আত্মাকে ভ্রষ্ট—স্খলিত—বলহীন দেখিব, তখন হে আত্মদাতা বলদাতা! আমি মাতৃ-ক্রোড়-চ্যুত ব্যাকুল শিশুর মত প্রার্থনা করিব,—

"অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা ঽমৃতং গময়"।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অদ্বৈত মতের সমালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন

"সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদংত্বয়োঃ ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥"

অর্থাৎ যেমন "সেই এই কালিদাস" এই কথাটির মধ্য হইতে 'সেই এবং এই' এই দুই বিরোধী ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র কেবল কালিদাসকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি তত্ত্বমসি এই বাক্যের মধ্য হইতে ত্বংশব্দ-সূচিত জীবের অবিদ্যা এবং তৎশব্দ-সূচিত ঈশ্বরের মায়া অর্থাৎ ঐশী শক্তি পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লক্ষিত হ'ন। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—আমি যখন কালিদাসকে প্রথমে দেখিয়াছিলাম তখন তিনি পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতেছিলেন, এখন দেখিতেছি যে, তিনি শকুন্তলা লিখিয়া মহাকবি হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম "সেই এই কালিদাস"। এই কথাটিকে দুই রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে;—এক এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, এখন তিনি সেই কালিদাসই বটে কিন্তু তাহা-ব্যতীত এখন তিনি মহাকবি কালিদাস—এখন ব্যাকরণ সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার মন বোঝাই করা রহিয়াছে। কালিদাসের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি সম্বলিত এই যে একত্ব ইহারই নাম সগুণ একত্ব synthetic unity "সেই এই কালিদাস" এই কথাটিকে অপর এইরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে তিনি মূর্খ ছিলেন এ কথা ছাড়িয়া দেও; আর, এখন তিনি মহা পণ্ডিত হইয়াছেন এ কথাও ছাড়িয়া দেও; দুই অবস্থার দুই কথা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ কেবল তিনি কালিদাস এই কথাটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর। এইরূপ, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুই-কূল-বর্জ্জিত কালিদাসকে কালিদাস বলাও যা আর খালিদাস বলাও তা—একই। কালিদাসের এই যে ফাঁকা একত্ব ইংরাজিতে যাহাকে বলে bare identity, ইহারই নাম নির্গুণ একত্ব analytic unity। শেষোক্ত দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পঞ্চদশীকার বলিতেছেন যে, কালিদাস হইতে যেমন তাঁহার পঠদ্দশা-সুলভ অজ্ঞানাবস্থা বাদ দেওয়া হইল, জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার জীবাবস্থা-সুলভ অবিদ্যা বাদ দেও; আর কালিদাস হইতে যেমন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা-সুলভ কবিতা-শক্তি বাদ দেওয়া হইল জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার পূর্ণাবস্থা-সুলভ ঐশী শক্তি বাদ দেও। এইরূপ জীবের পক্ষ হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের পক্ষ হইতে ঐশী শক্তি বাদ দিয়া কেবল মাত্র চৈতন্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এইরূপ নির্গুণ একত্ব যাহা অদ্বৈতবাদীরা প্রতিপাদন করেন তাহা ছাড়া বেদোপনিষদে আর-একরূপ একত্বের বহুতর উল্লেখ আছে—তাহার সাক্ষী "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" "তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপে (অর্থাৎ বাঁধের মতন) সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন"; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ঈশ্বর-দ্বারা সমস্ত জগৎ আদ্যোপান্ত আচ্ছাদিত রহিয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্তরূপ নির্গুণ একত্ব এবং শেষোক্তরূপ সগুণ একত্ব দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মায়া এবং অবিদ্যা লইয়া বাচালতা করিতে আমাদের দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সমান পটু। আপনারা যদি আমার মুখে সেই সকল কথার পুনরাবৃত্তি শুনিতে চা'ন, তবে অর্জ্জুন যেমন সম্মোহন

বাণে কুরুসেনাকে অচেতন করিয়া দিয়াছিলেন আমিও তেমনি "অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী" প্রভৃতি রাশি রাশি বাক্যে আপনাদের কর্ণকুহর প্লাবিত করিয়া আপনাদিগকে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে নিদ্রায় অচেতন করিয়া দিতে পারি। কিন্তু দেশকাল পাত্র বিবেচনায় তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া মায়া এবং অবিদ্যা শব্দের দার্শনিক তাৎপর্য্য আমি যেরূপ বুঝি তাহাই আমি আপনাদের নিকট ভাঙিয়া বলি।

সকলেই জানেন যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রম, মরীচিকায় জলভ্রম ইত্যাদি প্রকার ভ্রমই মায়া-শব্দের বাচ্য। কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি এটা হয় তো না জানিতে পারেন যে, মায়া শব্দের মুখ্য অর্থ তাহা নহে। মায়া-শব্দের মুখ্য অর্থ ইন্দ্রজাল অর্থাৎ লোকে সচরাচর যাহাকে বলে জাদু। রামায়ণে আছে শূর্পণখা-রাক্ষসী মায়ামৃগ সৃষ্টি করিয়া সীতাকে ছলনা করিয়াছিল। এরূপ স্থলে মায়া-মৃগের উৎপাদিকা শক্তি যাহা শূর্পণখার ইচ্ছাধীন তাহারই নাম মায়া; আর, সেই মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সীতার যেরূপ ভ্রম হইয়াছিল সেইরূপ ভ্রমের নাম অবিদ্যা। সমস্ত জীবজন্তু চরাচর ঈশ্বরের ঐশী শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে ইহা-দৃষ্টে পুরাতন কবিরা ঈশ্বরের ঐশী শক্তিকে ঐন্দ্রজালিকের মায়ার সহিত আর জীবজন্তু চরাচরের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞানকে মায়া-মুগ্ধ ব্যক্তির ভ্রমের সহিত উপমা দিয়া জীবাশ্রিত সেই অজ্ঞানের নাম দিয়াছেন অবিদ্যা। একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী বিনা অবলম্বনে শূন্যে বিধৃত রহিয়াছে, অচেতন অণ্ডের আবরণ ভেদ করিয়া সচেতন জীব—সমস্ত সাজ সজ্জা পরিধান করিয়া বিনির্গত হইতেছে, এ সকল ঐশ্বরিক ব্যাপারের ন্যায় পরমাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল কে কবে কোথায় দেখিয়াছে! মায়া কথাটা পুরাতন কবিদিগের উক্তি—তাহা কবিতা-ভাবে গ্রহণ করাই উচিত। ঐ কবির উক্তিটিকে চলিত ভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য ঐশী শক্তি। মহামায়া শব্দের অবিকল ইংরাজি অনুবাদ আর কিছু না—Great magical power। মায়াশব্দের অর্থ ঐশীশক্তি এটা আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে; পুরাণাদিতে ঐ ভাবের ভূরি ভূরি কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পাছে লোকে ঈশ্বরের ঐশী শক্তিকে রাক্ষস এবং দৈত্যদিগের তামসিক মায়ার সহিত সমান মনে করিয়া ভ্রমে পড়ে, এই জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে ঐশ্বরিক মায়া, দৈবী মায়া, আসুরী মায়া, রাক্ষসী মায়া, এইরূপ মায়ার নানা প্রকার শ্রেণী-বিভাগেরও অপ্রতুল নাই। অতএব ঈশ্বরের মহতী শক্তির প্রভাবকে মায়া বলিলে অথবা জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ ভ্রম-প্রমাদ-মোহকে অবিদ্যা বলিলে অসত্য কিছুই বলা হয় না;—কেবল এইটি মনে রাখিলেই হইল যে, ঈশ্বরের মায়া আসুরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী মায়া নহে; তাহা সত্ত্বগুণাত্মিকা সত্যময়ী মায়া। প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে চিরকালই আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশে তাহাকে দৈবী মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা-হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। সঙ্গীত মহলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নীচের সপ্তকের বিভিন্ন সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে শুনিতে যত কর্কশ লাগে—উপরের সপ্তকের বিভিন্ন সুর এক

সঙ্গে ধ্বনিত হইলে তত কর্কশ শুনায় না; এমন কি, প্রথম সপ্তকের সা'র সহিত যদি উপরিস্থ পঞ্চম সপ্তকের সা রে গা পা নি এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়, তবে ঐ স্বরগুলি এমনি লপেট হইয়া একতানে মিলিয়া যায় যে, মনে হয় একটি মাত্র স্বর সা একাকী ধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের অভ্যন্তরে এ যেমন—সৃষ্টির অভ্যন্তরে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের এক একটি বিভিন্ন স্বর হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া যতই উপরের সপ্তকের উপরের স্বরে উত্থান করে, ততই সহযাত্রীদিগের সহিত একতানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের ভাব গ্রহণে এবং প্রেমরসাস্বাদনে সমর্থ হয়। অতএব এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বর আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার জ্ঞানবান্ এবং হৃদয়বান্ জীবদিগের নিকটে ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত করিয়া প্রতিজনের অন্তঃকরণের যোগ্যতা অনুসারে তাহাকে আপনার অনুপম আনন্দের ভাগী করিবেন, ইহারই জন্য তিনি মনুষ্যকে আপন আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ঈশ্বরের মায়া করুণার প্রস্রবণ; তাহা আসুরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী বিভীষিকাও নহে, আর, অর্থশূন্য প্রলাপ-বাক্যও নহে। আজিকের এ সভা যদি দার্শনিক নবরত্নের সভা হইত, তাহা হইলে আমি জীবেশ্বরের কথা প্রসঙ্গে হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রাজ্ঞ, তৈজস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কল্পনা-প্রসূত নানা-উপাধি-বিশিষ্ট জীবেশ্বরের অবতারণা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এ কাল সে বিক্রমাদিত্যের কালও নহে—এ সভা সে নবরত্নের সভাও নহে, আর, মাথা নিতান্ত বিকল না হইলে তাহার জন্য লোকের মাথা ব্যথাও হয় না। অতএব এ সভায় আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমি যতদূর পারি সোজা কথায় বলিতে চেষ্টা করিব। মায়া কাহাকে বলে এবং অবিদ্যা কাহাকে বলে তাহা আমি বলিয়াছি। মায়া কি? না ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য ঐশী শক্তি। অবিদ্যা কি? না জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞান। অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী নিগুর্ণ একত্ব কিরূপ তাহাও বলিয়াছি। পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, "সেই এই কালিদাস" এই বাক্যের মধ্য হইতে কালিদাসের প্রথম বয়সের মূর্খতা এবং দ্বিতীয় বয়সের কবিতা-শক্তি বাদ দিয়া যেমন কালিদাসের পরিবর্ত্তে খালিদাস পাওয়া যায়, তেমনি জীবের মধ্য হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের মধ্য হইতে ঐশী শক্তি বাদ দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই জীব-ব্রহ্মের নিগুর্ণ একত্ব। আমি আজ আপনাদিগকে দেখাইব যে জীবেশ্বরের এই যে নিগুর্ণ একত্ব ইহা ঈশ্বরের সমগ্র একত্বের অনেক নিচের ধাপে অবস্থিতি করিতেছে। দেখাইব যে, এরূপ নিগুর্ণ একত্ব সাধকের প্রথম প্রয়াণ স্থান মাত্র, তা বই তাহা সাধকের চরম গম্যস্থান হইতে পারে না। প্রথমে জীবব্রহ্মের ঐক্যস্থানটি পঞ্চদশী যেরূপ পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিয়াছেন তাহা দেখাইব, তাহার পরে পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে জীবেশ্বরের মধ্যে যেরূপ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে তাহা দেখাইব। তাহার পরে তৎতদ্বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার চুম্বক ছবি কোথায় পাওয়া যায়, এ কথা

যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে। পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে অদ্বৈতমতের সার সিদ্ধান্ত যেরূপ সুন্দর দার্শনিক বিবেক-প্রণালী অনুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ-পারিপাট্য দেখিলে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সে বিবেক-প্রণালী আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে process of analysis। পঞ্চদশী প্রথমে জ্ঞানের সূর্য্যকান্ত মণিকে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহা হইতে জ্যোতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; তাহার পরে সেই জ্যোতিকে সূর্য্য এবং সূর্য্যকান্ত মণির—পরমাত্মা এবং জীবাত্মার ঐক্যস্থান করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জীবের সেই যে আত্মজ্যোতি তাহা কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন—'সম্বিৎ'। সম্বিৎ শব্দের ঠিক্ অর্থ যদি আপনারা জানিতে চা'ন তবে তাহা আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে consciousness যদি বলেন "কোথা হইতে পাইলে?" তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সম্বিতের ঐ অর্থটি উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। Latin ভাষায় যাহার নাম Con, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম সং। Con উপসর্গের ইংরাজি অনুবাদ with কিম্বা together with। সং উপসর্গের বাঙ্গালা অনুবাদ সব সহিতে মিলিয়া; তাহার সাক্ষী—বেদের একস্থানে আছে "সম্বদধ্বং" এবং বেদ-ভাষ্যে উহার অর্থ এইরূপ লেখা আছে যে, সহবদত অর্থাৎ সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে বল'। সমষ্টি-বন্ধন বলিতে বুঝায় সং-অষ্টি-বন্ধন, সমস্ত এক সঙ্গে জড়ো করিয়া আঁটি বাঁধা। সমাহার বলিতে বুঝায় সং-আহরণ একত্র করিয়া আনা—সমস্ত কুড়াইয়া একত্রে জড়ো করা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে summing up। সম্যক্‌রূপে কিনা comprehensively—এখানেও সং এবং con এ দুই উপসর্গের অর্থের মিল রহিয়াছে। একদিকে সং এবং con, আর এক দিকে বিদ্যা এবং science;—প্রথম দুটার মধ্যে যেমন অর্থসাদৃশ্য, শেষ-দুটার মধ্যে অর্থ সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে। con-পূর্ব্বক science-ও যা, আর, সং পূর্ব্বক বিদ্যাও তা, একই। আমার সঙ্গে এত দূর আসিয়া এখন-আর এ কথা বলিও না যে, consciousness এবং সম্বিৎ বলিতে একই অর্থ বুঝায় না—কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি করিও না। তা যদি কর তবে আরেকটি কথা বলি শ্রবণ কর;—কোনো ব্যক্তি মূর্চ্ছা গেলে আমরা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত বলি যে, এ ব্যক্তির চেতন নাই; কিন্তু একজন প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য সেরূপ স্থলে বলেন "এ ব্যক্তির সংজ্ঞা নাই", আবার, একজন নবীন ইংরাজিজ্ঞ দাক্তার বলেন "এ ব্যক্তির consciousness নাই। এস্থলে প্রবীণ এবং নবীন—বৃদ্ধ এবং অবৃদ্ধ—উভয়োর্ব্বচনং গ্রাহ্যং। অতএব সংজ্ঞা এবং consciousness এ দুই শব্দের অর্থ একই তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। জ্ঞা-ধাতুর অর্থও জানা, বিদ-ধাতুর অর্থও জানা—সংজ্ঞাও যা সম্বিৎও তা—একই; প্রভেদ কেবল এই যে, সংজ্ঞা-শব্দ সাহিত্য মহলে বেশী প্রচলিত—সম্বিৎ শব্দ দর্শন-মহলে বেশী প্রচলিত।

ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সুবিখ্যাত দর্শনকার Hamiltion consciousness শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পঞ্চদশীর গ্রন্থকার সম্বিৎ শব্দ অবিকল সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। Hamiltion বলিতেছেন—

In taking a comprehensive survey of the mental phenomena, these are all seen to comprise one essential element or possible only under one necessary condition. This element or condition is conciousness. In this knowledge they appear, or are realized of phenomena, and with this knowledge they likewise disappear, or have no longer a phenomenal existence; so that consciousness may be compared to an internal light, by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible." ইহার কিয়ৎ পরেই বলিতেছেন—

When I know, I must know that I know, when I feel, I must know that I feel—when I desir, I must know that I desir. The knowledge, the feeling, the desire, are possible only under the condition of being known. The expression I know that I know, I know that I feel, Iknow that I desire are translated by, I am conscious that I know, I am canscious that I feel, I am conscious thal I desire. Hamilton এই যাহা বলিতেছেন ইহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই যে, বিভিন্ন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সঙ্গে একই অভিন্ন জ্ঞান যাহা সাক্ষীরূপে লাগিয়া থাকে তাহারই নাম সম্বিৎ। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্
ততো বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥"

শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয় সকল বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত (অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ কিনা consciousness তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। সে দিন আমার একজন বন্ধু আমার কৃত ততঃ এবং তৎ এই দুই শব্দের অর্থ শুনিয়া সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমি টীকা হাতড়িয়া দেখিলাম যে, আমি ঐ দুই শব্দের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছিলাম টীকায় অবিকল তাহাই লিখিত রহিয়াছে; ইহা দেখিয়া একদিকে যেমন আমার আনন্দ হইল আর এক দিকে তেমনি দুঃখ হইল;—দুঃখের কারণ এই যে, এমন বিসদ টীকা সত্ত্বেও পুঁথির উৎকৃষ্ট মূল বচনগুলির অর্থ নানালোকে নানারূপ করেন, অথচ প্রকৃত তাৎপর্য্যটি তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যায়। আমি যে, ঐ দুটা শব্দ প্রথম দেখিবা মাত্রই ও-দুটার ঠিক্ অর্থ ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেননা বিবেক, বিবেচনা, analysis, বলিয়া যে একটা দার্শনিক প্রণালী আছে তাহা তৎপূর্ব্বে আমার জানা ছিল, আর তাহা জানা বড় যে একটা বেশী বিদ্যার কার্য্য তাহাও নহে—বারকত যাঁহারা ইংরাজি দর্শনের পাত উল্টাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা জানেন। টীকায় স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে "ততো বিভক্তা' কিনা "তেভ্যো বিভক্তা" সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত। ততঃ শব্দের অর্থ তস্মাৎ ও হয় আর তেভ্যঃ ও হয়—এখানে ততঃ শব্দের অর্থ তেভ্যঃ কিনা সেই সকল বিষয় হইতে। "তৎসম্বিৎ" ইহার অর্থ ফস্ করিয়া পাঠক মনে করেন যে, সেই সম্বিৎ; কিন্তু টীকাতে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে তৎসম্বিৎ কিনা "তেষাং শব্দাদীনাং সম্বিৎ" সেই শব্দাদির সম্বিৎ consciousness of those sensations of sound &c. বিভক্ত শব্দের অর্থ টীকায় এইরূপ আছে যে, "বুদ্ধ্যা বিবেচিতা" অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত analysed by the understanding; Hamilton প্রভৃতি যাহাকে বলেন distinguished but not separated। অতএব পঞ্চদশীর ঐ শ্লোকের অর্থ কিয়ৎপূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা তাহার অবিকল অনুবাদ। তাহা

আর-একবার বলি শ্রবণ করুন। "শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ" শব্দস্পর্শাদি বেদ্য বিষয় সকল (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে sensations) "বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্" বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। ততো বিভক্তা তৎসম্বিৎ" সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত (অর্থাৎ distinct) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ consciousness of those sensations, "ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে" তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। এইখানে বিবেচনা-পদ্ধতির বা বিবেক-পদ্ধতির হস্ত দেখা যাইতেছে—ইংরাজিতে যাহাকে বলে analysis। যেমন বালির সঙ্গে চিনি মিশ্রিত থাকিলে পিপীলিকা বালি হইতে চিনি পৃথক করিয়া লয়, তেমনি সম্বিৎ (consciousness) বিচিত্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধে জড়িত থাকিলেও আমরা তাহাকে সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখিতে পারি। পিপীলিকা মন্ত্র-গুণে কিছু-আর বালি হইতে চিনি বিবিক্ত করে না—চিনির আঘ্রাণ এবং স্বাদ পাইয়াই তাহাকে বালি হইতে বিবিক্ত করে। আমরা কি লক্ষণ দৃষ্টে সম্বিৎকে তাহার শব্দস্পর্শাদি উপরাগ-সকল হইতে বিবিক্ত করি? পঞ্চদশী বলিতেছেন "ঐকরূপ্যাৎ" একরূপতা দৃষ্টে। বিষয়-সকল অনেকরূপ—সম্বিৎ একরূপা। বাহ্য-বিষয় সকলের নানা জাতীয় বর্ণ, নানাজাতীয় শব্দ, নানাজাতীয় স্পর্শ, ইত্যাদি প্রকার নানা লক্ষণ; কিন্তু সম্বিতের লক্ষণ একটিমাত্র;—কি? না সাক্ষিত্ব। ইহা ভিন্ন সম্বিতের দ্বিতীয় লক্ষণ নাই। একটা কলের পুতুল উঠিতেছে, বসিতেছে, শুইতেছে, বেড়াইতেছে, সবই করিতেছে অথচ সে তাহার কিছুই জানিতেছে না। আমরা উঠি, বসি, দাঁড়াই, কথা কই, যাহা করি—তাহারই সঙ্গে একটা সাক্ষী লাগিয়া রহিয়াছে;—কে? না সম্বিৎ conciousness। আমাদের মনের সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে যদি একই সাক্ষী নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া না থাকিত তবে আমরা এক সময়ে যাহা ভাবি বা করি বা বলি তাহা অন্য সময়ে আমাদের স্মরণে উদ্বোধিত হইতে পারিত না। সম্বিতের সেই একমাত্র সাক্ষিতা-লক্ষণ দৃষ্টে জাগ্রৎকালে আমরা সম্বিৎকে ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ অর্থাৎ sensation, এই সকল নানা বিষয়ের সংশ্লেষ হইতে বিবিক্ত করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারি। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "তথা স্বপ্নে" স্বপ্ন-কালেও সেইরূপ। "অত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং" এখানে কিন্তু (অর্থাৎ স্বপ্ন-কালে) বেদ্য বিষয় সকল অস্থির কিনা অব্যবস্থিত, জাগ্রৎ কালে স্থির কিনা সুব্যবস্থিত। "তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ" স্বপ্নকাল এবং জাগ্রৎকাল দুয়ের মধ্যে বিষয়-ঘটিত এইরূপ প্রভেদ। "সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে" উভয় কালের সাক্ষীরূপা যে সম্বিৎ তাহা একই অভিন্ন। পঞ্চদশীর এই কথাটির প্রমাণ যদি আবশ্যক হয় তবে তাহা এই যে, স্বপ্ন-কালের এবং জাগ্রৎকালের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ যদি একই না হইত, তবে নিদ্রাভঙ্গের সময় নিদ্রাবস্থার কোনো স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহারো স্মরণে আবির্ভূত হইতে পারিত না। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ" সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতিতে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান অন্ধকার বোধ আবির্ভূত হয়—অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না এইরূপ স্মরণ হয়। স্মৃতি কিরূপ? না "সাচাববুদ্ধবিষয়া" অববুদ্ধবিষয়া—জ্ঞাত-পূর্ব্ববিষয়া। জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় ভিন্ন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় কখনো স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না। কমলা নেবুর গাছ দেখিবার সময় দর্শকের জ্ঞানে তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত ছিল বলিয়াই পরে যেমন তাহা তাহার স্মরণে আবির্ভূত হয়, তেমনি সুষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না" এই জ্ঞানটি সুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাগিতেছিল বলিয়াই পরে তাহার স্মরণ হয় যে নিদ্রাবস্থায় আমি কিছুই জানিতেছিলাম না। "অববুদ্ধং তৎ তদা ততঃ।"

অতএব সুষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না" এইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার সুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পঞ্চদশীর প্রদর্শিত এই প্রমাণটির তাৎপর্য্য শুধু এই যে, সুষুপ্তি-কালে সম্বিৎ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত থাকে বলিয়া তাহা যে তখন নাই এরূপ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেননা সমস্ত মনোবৃত্তির সাক্ষীরূপা একমাত্র সম্বিৎ যদি সুষুপ্তির সময় বাস্তবিকই না থাকিত তাহা হইলে তাহা সুষুপ্তির পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়া আসিতে পারিত না। তাহা হইলে পূর্ব্ব দিনের সম্বিৎ পরদিনে আসিতে না আসিতেই সুষুপ্তিরূপ দস্যুর হস্তে নিহত হইত। যখন তাহা নিহত হয় নাই, তখন তাহা অবশ্যই সুষুপ্তির আবরণের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান ছিল; যখন বর্ত্তমান ছিল, তখন অবশ্য সাক্ষিরূপেই বর্ত্তমান ছিল—কেননা লবণের যেমন লবণত্ব—সম্বিতের তেমনি সাক্ষিত্বই আদি অন্ত এবং মধ্য। আমি যদি প্রথম দিন কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া তৃতীয় দিনে কাশীতে উপনীত হই তবে তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, আমি দ্বিতীয় দিন মাঝের পথে ছিলাম। তেমনি একই অভিন্ন সাক্ষীরূপা সম্বিৎ যখন কালিকের দিন হইতে আজিকের দিনে উপনীত হইয়াছে, তখন সমস্ত মাঝের পথে তাহা বর্ত্তমান ছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না;—বর্ত্তমান যখন ছিল—তখন সাক্ষীরূপেই বর্ত্তমান ছিল; কেন না অসাক্ষী সম্বিৎও যা—অমিষ্ট মধুও তা, আর সোনার পাথর বাটীও তা—একই। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "নবোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ" সেই যে সুষুপ্তি-কালীন অজ্ঞান-অন্ধকার-বোধ তাহা অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ বিষয় হইতেই ভিন্ন, তা বই বোধ বোধ-হইতে বিভিন্ন নহে—সম্বিৎ সম্বিৎ-হইতে ভিন্ন নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ কালের সুব্যবস্থিত বিষয়-সকলের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ, স্বপ্ন-কালের অব্যবহিত বিষয় সকলের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ, এবং সুষুপ্তি-কালের অজ্ঞানান্ধকারের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ—তিন বিভিন্ন সম্বিৎ নহে কিন্তু একই অভিন্ন সম্বিৎ।

ক্রমশঃ।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সুন্দরকাণ্ড।

হনুমান এক লম্ফে লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম দুই সর্গে হনুমানের শক্তি সামর্থ্য ও আকাশপথে তাহার প্রয়াণ অতি উজ্জ্বল বর্ণে মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক চিত্রিত। বাল্মীকির মতে লঙ্কা গগনস্পর্শী এবং মেঘাকার পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত। তথায় সামুদ্রিক বায়ু নিরন্তর বহমান। লঙ্কার দ্বার সকল কণকময়, দ্বারবেদী মরকতময় মণিমুক্তা স্ফটিক-খচিত; ইতস্তত ক্রৌঞ্চ ময়ূরের কণ্ঠস্বরে ও রাজহংসের কলরবে শব্দায়মান। লঙ্কার সর্ব্বত্র দীপালোক, স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার। বলদর্পী রাক্ষসসৈন্য কর্ত্তৃক নিরবচ্ছিন্ন এই পুরী সুরক্ষিত।

প্রথমেই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসী আসিয়া বিকৃত মুখে বিকটনেত্রে হনুমানকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হনুমান তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দারুণে! সর্ব্বাগ্রে তোমার পরিচয় দাও। দুই এক কথার পর বিবাদ বাঁধিল এবং হনুমান প্রথমে আহত হইয়া তাহাকে বামমুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই প্রহার বেগে সে বিহ্বল হইয়া ভূমিসাৎ হইল।

হনুমান রাত্রিযোগে অদ্বার দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সমস্ত গৃহ সুধাধবল, উহার হীরকের গবাক্ষ সকল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে, রাজপথ সুপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ। গৃহাভ্যন্তরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদা সকল সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। কেহ বা করতালি দিতেছে, কেহ বা সিংহ

নাদ করিতেছে। কোথাও বা বেদমন্ত্র জপ এবং কোথাও বা বেদপাঠ হইতেছে। রাক্ষসেরা অতি স্থূল বা অতি কৃশ নহে অতি গৌর বা অতি কৃষ্ণ নহে। উহারা বিরূপ বহুরূপ সুরূপ ও সুতেজ; বিচক্ষণ মধুরভাষী ও আস্তিক। উহাদের পরিণীতা পত্নী সকল শুদ্ধস্বভাব মহানুভাব, পানাসক্ত প্রিয়ানুরক্ত লজ্জাশীল ও তাহাদের মুখকমল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। রাবণের প্রাসাদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; তথায় রাক্ষসী পত্নী ও বীর্য্যসমাহৃতা রাজকন্যাগণ বিরাজমান। তিনি ঐ দিব্যগৃহ দর্শনে মনে করিলেন, ইহা কি ভোগভূমি স্বর্গ না বরুণাদি লোক, ইন্দ্রপুরী অমরাবতী না কোন গন্ধর্ব্বের মায়া। রাজপত্নীগণকে দেখিয়া মনে করিলেন পুণ্যক্ষয় হইলে যে সকল তারকা গগনতল হইতে স্খলিত হয়, তাহারাই বুঝি এখানে মিলিত হইয়াছে। শয়নগৃহে যন্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকা চামর বীজন করিতেছে,আর রাবণ পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, নেত্রযুগল আরক্ত, পরিধানে স্বর্ণখচিত বস্ত্র। পানগৃহে সুবাসিত সুরা বিবিধ আহার্য্য বস্তু মৃগ মহিষ বরাহ মাংস স্তূপাকারে সঞ্চিত। হনুমান কোথাও সীতার উদ্দেশ না পাইয়া তথা হইতে নিক্রান্ত হইয়া অশোক বনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আশঙ্কা হইতে লাগিল বুঝি সীতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া এবং শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ইতস্তত দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি একটি কামিনীর উপরে নিপতিত হইল। দেখিলেন তিনি রাক্ষসগণপরিবৃতা, উপবাসে কৃশা ও দীনা, তাঁহার কান্তি ধূমজালজড়িত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, সর্ব্বকায় অলঙ্কার শূন্য ও মললিপ্ত। বলিতে কি তিনি স্বয়ং শোকের মূর্ত্তি ও দুঃখের উত্থিত তরঙ্গ, সরোজশূন্য দেবী কমলার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। হনুমান দেখিবামাত্র তাঁহাকে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। হনুমান ঐ রাত্রি ঐ বৃক্ষোপরি কাটাইয়া দিলেন। শর্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট, দেখিলেন রাবণ বহু রমণী পরিবৃতা হইয়া অশোক বনের দ্বারদেশে উপস্থিত। সীতা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাবণ অগ্রসর হইয়া দূর হইতে তাঁহাকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। উত্তরে সীতা কহিলেন রাবণ! আমার অভিলাষ পরিত্যাগ কর, তুমি ঐশ্বর্য্যে বা ধনে কদাচ আমাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না। রাবণ অকৃতকাম হইয়া রাক্ষসীগণকে বলিলেন তোমরা যেরূপে পার সীতাকে আমার বশবর্ত্তিনী কর এবং শীঘ্র তাহাকে আমার প্রীতিপ্রবণ করিয়া দাও; এই বলিয়া সীতাকে তর্জ্জন করিতে করিতে অশোক কানন হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে রাক্ষসীরা সীতার অনুরাগ রাবণের প্রতি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য কখন বা মিষ্ট বচনে কখন বা ভয় প্রদর্শনে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী বৃদ্ধা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, আমি আজ রাত্রি শেষে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। বোধ হয় এক সীতার জন্য রাক্ষসরাজ সংবংশে বিনষ্ট হইবেন। তোমরা যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, নিষ্ঠুর বাক্য পরিত্যাগ কর, স্নেহবচনে ইহাঁকে সান্ত্বনা দাও, ইহার মঙ্গল ভিক্ষা কর। রাক্ষসগণের ভাগ্যে রাম হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত। ইহাতে রাক্ষসীগণ সকলেই যৎপরোনাস্তি ভীতা হইয়া পড়িল।

হনুমান এক্ষণে সীতার সহিত কথোপকথনের অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং সুবিধা বুঝিয়া সীতার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও তাঁহাকে আত্মপরিচয় নিবেদন করিলেন। সীতা রামের গুণকীর্ত্তনছলে কহিলেন তিনি কুবেরের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাযশা, বিষ্ণুর ন্যায় (স্বয়ং বিষ্ণু নহেন) বীর্য্যবান, বৃহস্পতির ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ইত্যাদি। হনুমানও সীতাবিরহে রামের কাতরতার আভাস দিলে

সীতা কহিলেন, দূত! তোমার কথা বিষ-মিশ্রিত অমৃত। রাম অনন্যমনে আছেন এই বাক্য অমৃত, আর তিনি যে নিতান্ত শোকাকুল রহিয়াছেন এই কথা বিষ। নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছে, তদনুসারে এইটি দশম মাস, বর্ষ পূর্ণ হইবার আর দুই মাস অবশিষ্ট আছে, কালবিলম্ব হইলে আমি বিনষ্ট হইব। বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু দুষ্ট তাহাতে সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়াছে, কৃতান্ত তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। হনুমান কহিলেন দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ পাইবা মাত্র সসৈন্যে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। অথবা তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। আমি অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষসদুঃখ হইতে উদ্ধার করিব। অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে হব্য কব্য প্রদান করে, সেইরূপ আজি সেই শৈলবিহারী রামের হস্তে তোমায় অর্পণ করিব। আজি তুমি বিষ্ণুর ন্যায়(?) পরাক্রান্ত রাম লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, এ বিষয়ে ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিও না। এই বলিয়া তিনি জানকীকে আপনার পূর্ণরূপ প্রদর্শন করিলেন, সীতা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা বীরপত্নীর ন্যায় অন্যান্য কথার সহিত হনুমানকে বলিলেন, আমি পতিভক্তির অনুরোধে রামব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক নহি; রাবণ বলপূর্ব্বক আমাকে তাহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল, কি করিব, আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম; এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যান তাঁহার উচিত কার্য্য হইবে। আমি তাঁহার বলবীর্য্য জানি; দেবগন্ধর্ব্ব উরগ রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। হনুমান বিস্মিত হইয়া কহিলেন তোমা ব্যতীত এরূপ আর কে বলিতে পারে, ইহা সেই মহাত্মা রামের সহধর্ম্মিণীর উপযুক্তই হইতেছে। এই বলিয়া সীতা সাশ্রুনয়নে হনুমানের হস্তে রামের বিশ্বাসার্থ অভিজ্ঞান দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

হনুমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া গমন কালে ভাবিলেন আমি ত জানকীর দর্শন পাইলাম, কিন্তু একবার শত্রুপক্ষের অন্তর্ব্বল পরীক্ষা করা আবশ্যক। এই বলিয়া অশোক বন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণ এ সংবাদে চিতাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অশীতি সহস্র কিঙ্কর বীরগণকে নিয়োগ করিলেন। হনুমানের দেহ সমরোৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি তোরণের এক প্রকাণ্ড অর্গল গ্রহণ করিয়া—উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ বিনষ্ট হইল, হতাবশিষ্ট দ্রুতপদে পলায়ন করিয়া রাবণকে সংবাদ দিল। রাবণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া জম্বুমালীকে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে হনুমান চৈত্য প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন; এবং জম্বুমালীকে গর্দ্দভ সহিত রথে সমাগত দেখিয়া অচিরে এক পরিঘের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিকুমারগণকে হনুমানের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু হনুমানের হস্তে কেহই রক্ষা পাইল না। ক্রমে বিরূপাক্ষ যূপাক্ষ প্রভৃতি পাঁচ জন বীর ও কুমার অক্ষ রণে ধরাশায়ী হইলে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধানে হনুমানকে বদ্ধ করিয়া রাবণের সমীপে লইয়া চলিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র বীর্য্য হনুমানের নিকট মোচ্য হইলেও তিনি নিজে কোনরূপ বল প্রয়োগ করিলেন না। তিনি এতক্ষণ রাবণের সহিত কথোপকথনের অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। হনুমান রাক্ষসরাজের নিকট আত্মপরিচয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, তুমি যাহাকে জানকী বলিয়া জান, যিনি তোমার আলয়ে আবদ্ধ আছেন, তিনি স্বয়ং লঙ্কানাশিনী কালরজনী, তুমি সেই সীতারূপী মৃত্যুপাশ স্কন্ধে সংলগ্ন রাখিও না। রাবণ ক্রোধে

প্রদীপ্ত হইয়া জীর্ণ কার্পাসবস্ত্র দ্বারা হনুমানের পুচ্ছ বেষ্টন করিতে লাগিলেন এবং উহাতে তৈলসেক করিয়া অগ্নিপ্রদান করিলেন। জ্বালাকরাল হুতাশন দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিল। তখন হনুমান লঙ্কার গৃহোপরি বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহ প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। হনুমান স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক লাঙ্গুলের অগ্নি সমুদ্রের জলে নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন। পরিশেষে জানকীর সহিত পুনর্ব্বার অশোকবনে সাক্ষাৎ করিয়া সেই তরঙ্গাকুল ভীষণ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং যাহা ঘটিয়াছিল সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞানের সহিত রামকে সমুদায় নিবেদন করিলেন। এইখানেই সুন্দরকাণ্ড শেষ হইল।

বিষ্ণুপুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বর্ত্তমান ভারতে স্বাধীন-ভাব ও স্বাধীন-চিন্তা নিবন্ধন তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। অনুকূল ও প্রতিকূল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে দেশীয় ধর্ম্মজীবন—সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ স্থায়ী আকার ধারণ করিবে, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। সুবিধার মধ্যে দেশীয় প্রকৃতি ধর্ম্মের যেরূপ অনুকূল, তাহাতে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন বিধ প্লাবনের হস্তে জনসমাজের বিপর্য্যয় হইবার বড় আশঙ্কা নাই। ইউরোপ বা আমেরিকা খণ্ডে বাণিজ্যগত, রাজনীতিগত, ভোগবিলাসগত, সৌন্দর্য্যগত, স্বার্থগত প্রভৃতি কত শক্তি শতসহস্র বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া তবে তাহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখ এ দেশের ব্যক্তিগত বা সমাজ গত লক্ষ্য এক ধর্ম্মের দিকে। এই ধর্ম্মের নামে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এ দেশ কখন বা অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়াছে, কখন বা ইহার গৌরবান্বিত প্রশস্ত ললাটে পৌর্ণমাসী চন্দ্রের বিমল স্নিগ্ধ আলোক ব্যাপককাল ধরিয়া ক্রীড়া করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে এদেশে জনকজননী অপত্যস্নেহ বিস্মৃত হইয়া আপন সন্তানকে ভাগীরথীজলে ডুবাইতে পারে, বয়োবৃদ্ধ সন্তান ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হইয়া মৃতপিতার সহিত জীবন্ত মাতাকে অগ্নিসাৎ করিতে পারে, ধর্ম্মের নামে মাতা অপোগণ্ড সন্তানকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তীর্থের উদ্দেশে ছুটিতে পারে, যুবা পত্নীপ্রেম বিচ্ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্য লইতে পারে, কেহ বা ঊর্দ্ধবাহু কেহ বা অধঃশিরা হইয়া জীবনের সমুদায় ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া ধর্ম্মের মহিমা উচ্চকণ্ঠে গাইতে পারে, নির্ম্মম অশির আঘাতে মুকপশুরক্তে ধরাগাত্র কলঙ্কিত করিতে পারে, বামাচার বীরাচারে আপনার জীবনকে কলুষিত করিতে পারে, আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়া পথের ভিখারী হইতে পারে, বৃক্ষমূলে বা গিরিগুহায় প্রচ্ছন্নভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এদেশে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম্মের নামে কি না অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যুত ধর্ম্মের জন্য অন্ধ এমন জাতি আর জগতে নাই। লোকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রখর জ্ঞানকে এদেশে অনেক সময়ে ধর্ম্মের নিকট বলিদান দিতেও ত্রুটি করে নাই। প্রাচীনত্বের উপর যে দেশের এত মমতা, বেদের উপর যে দেশের এরূপ অটল নির্ভর, ধর্ম্মের নামে যে দেশ এত উন্মত্ত, সে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত সাধন-সাপেক্ষ উন্নততম ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে চারিদিকে দৃষ্টি রাখা চাই, জাতীয় প্রকৃতি স্থিরভাবে আলোচনা করা চাই। ইতিহাসের অতীত যুগ হইতে এদেশে ধর্ম্মবিপ্লবের ত অল্পতা হয় নাই। কিন্তু কেন তাহারা বদ্ধমূল হইতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে সত্যের অল্পতা বা তাহাদের সহিত মানব প্রকৃতির অনুপযোগিতাই যে তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ এমন নহে। অনেক স্থলে না বুঝিয়া জাতীয় প্রকৃতি প্রবৃত্তির উপর মর্ম্মান্তিক অবহেলা, ঐ সকল ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশের বীজ রূপে প্রচ্ছন্ন ছিল,

ভাবীকালে তাহাতেই তাহাদের অকাল পতন হইল, আমাদের এইরূপ ধারণা।

পাশব বলে অন্তত আজকাল নূতন ধর্ম্ম প্রচার করা যায় না, বিদ্বেষ বুদ্ধিতে প্রচলিত ধর্ম্মের দোষ দেখাইয়া বিদ্রূপ করিলে ধর্ম্মপ্রচারের পথ প্রমুক্ত হয় না। বিনয়ের সহিত এমন করিয়া প্রচার করিতে হইবে, এখনই স্থিরভাবে সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার উপর সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, যে তাহাতে যেন লোকে বিচলিত হইয়া না উঠে, তাহাদের অভিমান যেন উদ্দীপ্ত না হয়, তাহাদের অন্তরে অনুকূল তরঙ্গ জাগাইয়া তুলিতে না তুলিতে যেন প্রতিকূল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচারকের ঈপ্সিত উদ্দেশ্যকে ডুবাইয়া না ফেলে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সমগ্র ভারতে যেরূপ ছাইয়া পড়িয়াছিল এমন আর কোন ধর্ম্মের হয় নাই; হইবে যে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বেদনিন্দা যেরূপ দম্ভের সহিত কীর্ত্তিত হইত, তাহাতেই বুঝি এই ধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হইল। আমরা বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও পতন সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথমে মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন

"কো নগ্নঃ কিং সমাচারো নগ্নসংজ্ঞাং লভেৎ নরঃ"।

নগ্ন কাহাকে বলে, তাহার আচার কি, কি রূপেই বা লোকে নগ্ন পদবী লাভ করে। পরাশর বলিতেছেন

ঋগ্‌যজুঃসাম সংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতির্দ্বিজ
এতামুজ্‌ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ।

ঋক্ যজু সাম এই বেদত্রয় সমুদয় বর্ণের আবৃতি বা আচ্ছাদক স্বরূপ; যে মোহবশত এই ত্রয়ী পরিত্যাগ করে, লোকে সেই পাতকীকে নগ্ন (উলঙ্গ) বলে। আমার পিতামহ ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ট দেবের নিকট নগ্নদিগের বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে দেবাসুরে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে হ্রাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করে। পরাজিত দেবগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর কূলে গিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে দেবগণ কহিলেন, আমাদের শত্রুগণ স্বস্ববর্ণধর্ম্মে অভিরত, বেদমার্গানুসারী তপঃসম্পন্ন; সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহাতে আমরা অসুরগণকে বিনাশ করিতে পারি, আপনি এরূপ কোন উপায় বিধান করুন। ভগবান বিষ্ণু দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া কহিলেন, এই মায়ামোহ সমুদয় দৈত্যকে মোহিত করিবে; পরে তাহারা বেদবহিষ্কৃত হইলে তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে। দেবগণ! এক্ষণে তোমরা গমন কর, ভয় করিও না, এই মায়ামোহ তোমাদের অগ্রে গমন করুক, ইহা দ্বারা তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। মায়ামোহ তাঁহাদের সহিত গমন করিয়া দেখিল অসুরগণ নর্ম্মদাতীর আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিতেছে। (১৮শ অধ্যায়)। সেই মায়ামোহ দিগম্বর, মুণ্ডিত মুণ্ড ও বর্হিপত্রধারী হইয়া অসুরগণকে মনোহর বাক্যে কহিতে লাগিল, আমার উপদেশ অনুসারে চল ও আমি যে ধর্ম্ম বলিব তাহা স্বীকার কর। এই ধর্ম্মই মুক্তির হেতু। এই বলিয়া বেদবহির্ভূত ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত করিল; অর্হত্যেবং মহাধর্ম্মং (যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহারা আর্হত বলিয়া বিখ্যাত)। আরও কহিল যদি তোমরা নির্ব্বাণ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসাদি দুষ্টকর্ম্মে কোন ফল নাই জানিবে এই জগৎ অনাধার। মায়ামোহমোহিত অসুরগণ অল্পকালের মধ্যে বেদের নিন্দা ঘোষণা করিতে লাগিল। কেহ বা দেবগণের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এরূপ কুতর্ক উপস্থিত করিল, যজ্ঞার্থে

প্রাণিহিংসা ধর্ম্মজনক হইতে পারে না। ঘৃত অনলে দগ্ধ হইয়া ফলপ্রদান করে ইহা বালকের বাক্য। যজ্ঞফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি ইন্দ্রের সহিত শমীকাষ্ঠ ভোজন করিতে হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা পশুরা শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহারা কোমল পত্রাদি ভক্ষণ করে। যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে সেই পশু যদি স্বর্গলাভ করে, তাহা হইলে যজমান কেন না স্বীয় পিতাকে বলিদান দিয়া তাঁহাকে স্বর্গে উপনীত করে। শ্রাদ্ধকালে এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি মৃতব্যক্তির তৃপ্তিহয়,তাহা হইলে প্রবাসগত ব্যক্তির নিকটে পুত্রাদি দত্ত অন্ন কেন না উপস্থিত হয়। এইরূপে শিক্ষিত হইয়া অসুরেরা বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। দেবগণও অবসর বুঝিয়া যুদ্ধকরণার্থ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবাসুরের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবতারা সৎপথপরিপন্থী অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। পূর্ব্বে অসুরগণের স্বধর্ম্মরূপ যে কবচ ছিল, তদ্দ্বারাই তাহারা রক্ষা পাইত। এক্ষণে সে বর্ম্ম অন্তর্হিত হওয়ায় সহজেই তাহারা বিনষ্ট হইল। মৈত্রেয় এই সময় অবধি যাহারা মায়ামোহপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছে তাহাদিগকে নগ্ন বলা যায়। কেন না তাহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না, একাসনে উপবিষ্ট হইবে না, বা তাহাদের মুখদর্শন করিবে না।

একদা শতধনু নামে রাজা স্বীয় মহিষী শৈব্যার সহিত কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাসান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন সম্মুখবর্ত্তী সমাগত এইরূপ এক পাষণ্ডকে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাহার সহিত অলাপ করিলেন বটে কিন্তু মহিষী বাক্‌যতা হইয়া রহিলেন এবং ও সূর্য্যদর্শন করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। সেই পাপে রাজা ক্রমান্বয়ে কুক্কুর যোনি, শৃগাল যোনি, বৃক যোনি, গৃধ্রযোনি, কাক যোনি, ময়ূর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মহাত্মা জনকের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে নগ্নেরা বৌদ্ধগণের নামান্তর মাত্র। তাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া আপনাদিগকে যে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন,উল্লিখিত রূপক বর্ণনা তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী।

বৌদ্ধগণের মধ্যে আর্হত সম্প্রদায় অতীব প্রাচীন। অনেকে বলেন শাক্যসিংহের পূর্ব্ব হইতেও তাঁহার অস্তিত্ব ছিল। বৌদ্ধেরা যে জ্ঞানে অনুন্নত ছিল এমন নহে। আস্তিক হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের বৈরীভাব এতই প্রবল ছিল, যে তাহারা আপনাদের জন্য সাহিত্য ব্যাকরণ অভিধান সমুদয়ই নূতন করিয়া লইয়াছিল। বেদের ভাষ্যকার মহীধর একজন বৌদ্ধ ছিলেন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত বৌদ্ধদিগের প্রতাপে টলটল করিতেছিল। ভারতের অতিরিক্ত বীর্য্য চীন-জাপান, সিংহল-ব্রহ্মে যাইয়া পড়িয়া তত্তৎদেশে বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিল বটে, কিন্তু এদেশে শূন্যবাদ বেদনিন্দা স্থান পাইল না। বৌদ্ধধর্ম্মের তরঙ্গ বৈদিক ভারতকে আঘাত দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাহইতে বিলম্বে যে প্রতিঘাতের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম আমূল কাঁপিয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্ম আর সে তেজ সহ্য করিতে পারিল না; আপনিই নির্বীর্য্য হইয়া যবনিকার অন্তরালে লুকায়িত হইল, আর তাহার চিহ্ন রহিল না।

তাই বলিতে ছিলাম এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সময়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। একটু অসাবধান অসহিষ্ণু হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আভ্যন্তরিক স্বর্গীয় মর্য্যাদার উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার সাধারণের অবসর থাকিবে না। অথচ এক দারুণ কোলাহল উত্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষুদ্রকণ্ঠকে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা পাইবে। এবং এই প্রতিঘাতের তরঙ্গ চলিয়া গিয়া আমাদের কার্য্যক্ষেত্র কবে যে নিরুপদ্রব হইবে তাহার আশায় আমা-

দিগকে আর গালে হাত দিয়া থাকিতে হইবে না; ও অনুকূল বায়ুর প্রতীক্ষায় প্রচারের নৌকা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে না। সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য সকলেই প্রয়াসী, তবে সকল প্রকার উন্নতি সাধনের জন্য ধীরতা ও কৌশলের আবশ্যক, ইহাই আমাদের মূল কথা। ফলতঃ প্রাচীন শাস্ত্রের উপর দোহাই দিয়া অথচ সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সহিষ্ণু ভাবে প্রচার করিলেই সমধিক ফললাভের সম্ভাবনা। এবিষয়ে কি পুরাকালে কি বর্ত্তমানে আমাদের দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১৮৯ ৻৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৩৯৭।৩
সমষ্টি	...	১৫৮৬।৯
ব্যয়	...	৯৩০॥০
স্থিত	...	৬৫৫৸৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১৪৮৸৯
	৬৫৫৸৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১১৮॥০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲

এককালীন দান।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	২৲
পুরাতন কড়িকাষ্ঠ ও বরগা বিক্রয়ের মূল্য	১৬॥০
	১১৮॥০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	১৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়,	কলিকাতা		১২৲
" " মথুরানাথ রায়,	ঐ		৩৲
৺ " জয়গোপাল সেন,	ঐ		১৲
			১৬৲
পুস্তকালয়		...	১॥৶৯
যন্ত্রালয়	...	...	৫১॥/৯
গচ্ছিত	...	...	৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন			॥০
সমষ্টি			১৮৯ ৻৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৭৭৬।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৩॥৶০
পুস্তকালয়	...	২০।/৯
যন্ত্রালয়	...	১০০/৩
সমষ্টি	...	৯৩০॥০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৪৬ সংখ্যা ১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বর্ষশেষ উপলক্ষে উদ্বোধন।

রাত্রিকাল।

কালের প্রভাব দ্বারা আমাদিগের জন্ম বৃদ্ধি এবং ক্ষয় হয়। মৃত্যুর পরেও পরলোকে যাইবার সময়ে কালের অবলম্বন চাই। পূজ্যপাদ পিপ্পলাদ ঋষি সম্বৎসর কালকে প্রজাপতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন মৃত্যুর পর মানবাত্মার গমনের জন্য এই প্রজাপতির গর্ভে দুইটি পথ প্রসারিত আছে। একটির নাম দক্ষিণায়ন ও অপরটির নাম উত্তরায়ণ। এই দক্ষিণায়ন পথ শাস্ত্রে পিতৃযান বলিয়া কথিত হয়, আর উত্তরায়ণ দেবপথ। মানবদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রজাকাম, যাঁহারা উচ্চতর পার্থিব সুখের বাসনা করিয়া পরলোকে যাইবার ইচ্ছায় এখানে সদনুষ্ঠানমাত্র করেন তাঁহারা পিতৃযান দিয়া ভোগার্থ পুণ্যলোকে গমন করেন। পরন্তু তথাকার পরমায়ু শেষ করিয়া পুনরায় সংসার গতিকেই প্রাপ্ত হয়েন—তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও মৃত্যুভয়ের অপলাপ হয় না। কিন্তু সংসারে সদনুষ্ঠানসম্পন্ন থাকিয়া তদুপরি যাঁহারা তপস্যা করেন, ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করেন এবং শ্রদ্ধার সহিত, জ্ঞানের সহিত অনুসন্ধান করিয়া পরমাত্মাকে লাভ করেন, বাহিরে এবং অন্তরে—অনুষ্ঠানে ও উপাসনায় ব্রহ্মকার্য্য সম্পন্ন করেন সেই প্রদীপ্ত ব্রাহ্মেরা উত্তরায়ণ দিয়া সেই দিব্যধামে গমন করেন যেখানে মৃত্যু নাই, ভয় নাই। যেখানে একবার উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর এই জরা-মৃত্যু-শোক-দুঃখপূর্ণ সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না।

অদ্য আমাদের জীবনের এক বৎসর পরিসমাপ্ত হইল, মৃত্যুর দিন আরো নিকটবর্ত্তী হইল। যদি মৃত্যুকে স্মরণ হয়, যদি মৃত্যুর গভীর অন্ধকারময় ভীষণ-রাজ্যের পরপারে দিব্যালোকে গমন করিয়া সুখী হইবার ইচ্ছা হয়, তবে এস, এখন আমরা প্রজাপতি-ব্রত অবলম্বন করি। এই ব্রত অবলম্বন করিয়া তপস্যাচরণ করি, ব্রহ্মচর্য্যে দৃঢ় হই এবং সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করি। এই ব্রত অবলম্বন করিয়া মনের কুটিলতা পরিত্যাগ করি, মায়ার আসক্তি ছিন্ন করি। এই

প্রকার ব্রত-পরিশুদ্ধ আত্মাই ব্রহ্মোপাসনার পুষ্প।

হে ব্রহ্মোপাসক বন্ধু, এস, একবার আমরা এই পুষ্পোপহার ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করি যে, হে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তোমার সৃষ্টি সঙ্কল্পময় বাহ্য প্রভাবের মধ্যে তোমার সত্যস্বরূপ পিহিত রহিয়াছে, আমাদের জন্য এই রহস্যের দ্বার খুলিয়া দাও, আমরা যে তোমার সাধক, আমরা একবার তোমার অমৃত মুখ দর্শন করি। হে ব্রাহ্মবন্ধু, অদ্যকার রজনীর অন্ধকার দিয়া সম্বৎসর কাল চলিয়া যাইতেছে, এস এখন একবার আমাদের জীবনের পাপ পুণ্য গণনা করি এবং এই ঋক্‌মন্ত্রে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাতে সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হই—"আমাদের প্রাণ বায়ু বাহিরে অমৃত বায়ু সাগরে মিশিয়া গেল, আর আমাদের শরীর ভস্মান্ত হইতে চলিল, অতএব হে মন, এখন তুমি নিজ পাপ পুণ্য স্মরণ কর। হে ব্রহ্ম, তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মধন লাভের জন্য সুপথ দিয়া লইয়া চল, তুমি আমাদের সকল পাপ পুণ্য জ্ঞাত আছ, তুমি আমাদের পাপকে আমাদের আত্মা হইতে পৃথক কর—আমরা তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং ওঁ ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ক্রতোস্মর কৃতংস্মর। ব্রহ্মন্ নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানিদেব বয়ুনানি বিদ্বান্ যুজোধ্যস্মজ্জুহরাণো মেনো ভূয়িষ্ঠান্তে নমউক্তিং বিধেম।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক। ২২ মাঘ বুধবার।

বিবেক ও বৈরাগ্য।

"স্মর পরমেশ্বরে বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে" এই উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কঠোরতা সহকারে বস্তুবিচারের নাম বিবেক। সকল বস্তুই অনিত্য, এই আছে এই নাই; ধন বল, ঐশ্বর্য্য বল, স্ত্রী বল, পুত্র বল, কেহই চিরস্থায়ী নহে, কেহই চির দিন সমান সুখ-প্রদ হয় না। যাহা হইতে এক সময় সুখ পাই, সেই আবার অন্য সময়ে দুঃখের কারণ হয়; প্রগাঢ় মনঃসংযোগ সহকারে এইরূপ আলোচনাই বিবেক। এই বিবেক হইতেই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়।

সংসারে বিরাগ কি না অনাসক্তি। এই অনাসক্তি হইতেই এক প্রকার উদাস ভাব আত্মায় উপস্থিত হয়। এই উদাস ভাবই ঈশ্বরে আত্মা সমাধানের বিশেষ অনুকূল। ইহা সাধক মাত্রেরই পরীক্ষিত বিষয়। উদাস ভাবের সময়েই শুভক্ষণে ঈশ্বরের প্রতি শুভদৃষ্টি হয়। সেই শুভ দৃষ্টিই তাঁহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়া দেয়। সেই অনুরাগই সাধকের সর্ব্বস্ব ও চিরানন্দের কারণ। সেই অনুরাগ শান্তিরসের প্রস্রবণ। সেই অনুরাগই সাধককে ঈশ্বরের সহিত চির মিলনের আনন্দ দান করে। অতএব আমরা যদি চির জীবন উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া কেবল পাঠ ও শ্রবণ করি, আর যত্ন সহকারে বিবেক ও বৈরাগ্য সাধন না করি, তাহা হইলে কখনই বিশেষ ফল লাভ বা ঈশ্বরলাভ করিতে পারিব না। এই হেতু কি কি উপায় অবলম্বন করিলে, মনে বিবেক ও বৈরাগের উদ্দীপন হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান চাই। কেবল মায়াবশে রসোল্লাসে দিন চলিয়া গেলে কি ফলোদয় হইবে? আমরা চিরদিনই এই মায়াবশে আসক্তিপাশে বদ্ধ হইয়া সেই শিব সুন্দরের মন্দিরের বাহি-

রেই রহিলাম, সন্তাপাশ্রু জলে ধরণীকে অভিষিক্ত করিলাম, এক দিনও মন্দিরের ভিতরে যাইয়া তাঁহার পাদ-পদ্ম প্রেমাশ্রু জলে ধৌত করিলাম না—হা! জীবন বৃথাই চলিয়া গেল!

বিবেক ও বৈরাগ্যকে উদ্দীপন করিবার জন্য প্রধান উপায় মৃত্যুকে স্মরণ ও শ্মশান ও সমাধিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ। জ্ঞানীগণ এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কোন এক প্রতীচ্য সম্রাটের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, যে তিনি তাঁহার প্রাসাদ মধ্যে এমন এক জন ভৃত্য রাখিয়াছিলেন, যাহার কার্য্যই এই ছিল, যে সে প্রতি প্রাতঃকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইয়া মহারাজকে বলিত, মহারাজ! মৃত্যুকে স্মরণ করুন, নিশ্চয়ই এক দিন আপনাকে মরিতে হইবে। ইহার ফল এই হইত, যে সমস্ত দিনের মধ্যে এক বারও পররাজ্য গ্রহণ পরপীড়ন কোন প্রকার প্রলোভন বা নিষ্ঠুরতার ভাব রাজার মনে আসিত না। কোন প্রকার প্রবল বাসনা—শোক এবং নানা প্রকার ভয়ও তাঁহার মনে স্থায়ী হইত না, কারণ তিনি মৃত্যুর উপদেশেই বুঝিতেন, এ সকল চিরস্থায়ী নয়। এই প্রকারে তাঁহার মন প্রতি দিনই প্রশান্ত থাকিত। তাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঠিক্ হইত, এবং শান্ত স্বরূপ ঈশ্বরেও মন সহজে সমাধান করিতে পারিতেন। জরমন্ দেশের কোন এক প্রধান সম্রাট বিষয়-সুখে অতৃপ্ত হইয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া নিজে আশ্রমবাসী হইলেন।

পরিশেষে এক দিন বিশেষ রূপে বৈরাগ্য সাধনের জন্য স্বীয় শরীর শবাধারে রক্ষিত করাইয়া আপনাকে সমাধি-ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন, অবশ্য প্রোথিত হইবার জন্য নহে—মৃত্যুর বিশেষ স্মরণই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অতএব জ্ঞানীগণের আচরণ দেখিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস কর। আর "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর, অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর"। প্রতি দিন কল্পনা-বলে ধ্যান-যোগে দেখ, নিজ শরীর মৃত হইয়া কাষ্ঠ লোষ্টের সমান এই তোমার জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। তবে বৈরাগ্য সাধন করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় উপায় শ্মশানে ভ্রমণ। এখানে মৃত্যুর ছবি সদাই বিরাজমান থাকে। কত শৃগাল কুক্কুর, কত শকুনি গৃধিনী মৃত শরীর লইয়া টানা টানি করিতেছে। তাহা দেখিয়া কি মনে হয় না, যে ঐ চক্ষুঃ যাহা এক্ষণে জ্যোতিহীন তাহা হয়ত এক সময়ে কত অভদ্র দর্শন করিয়াছে, হয় ত ক্রোধে রক্ত-বর্ণ হইয়া কত লোকের ভীতি ও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে, হা! তাহাকেই এক্ষণে শকুনি গৃধিনী প্রাণ পণে চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতেছে। ঐ জিহ্বা যাহা কত সময়ে পরনিন্দায় নিযুক্ত হইয়া জীবন্ত মনুষ্যকে চর্ব্বণ করিত, আজি তাহাকে শৃগাল কুক্কুরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছে। ঐ হস্ত যাহা হয়ত এক সময়ে কত লোককে আঘাত করিয়াছে, আজি তাহা চিতার অনলে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। ঐ উদর যাহা কত লোককে কাঁদাইয়া পরিপূরিত হইয়াছিল, আজি তাহা শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়াছে। এই হৃদয় যাহা এক সময়ে পরের দুঃখ দেখিয়া হয় ত সুখ অনুভব করিত, আজি তাহা চিতার অনলে ভস্মসাৎ হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমরা কি প্রাণ থাকিতে থাকিতে, এই চক্ষে ভদ্র দর্শন

করিব না? স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত দ্বারা মনুষ্যকে সুখী করিব না? ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে জীবনকে সার্থক করিব না? জিহ্বাকে সত্য ও মিষ্ট কথায় নিযুক্ত রাখিব না? তদ্দ্বারা ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করিব না? হস্ত দ্বারা কি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব না? পরের অশ্রুমার্জ্জনা করিব না। পরপীড়ন না করিয়া উদর পূরণ করিব না? এই হৃদয়ে সেই রাজরাজ প্রেমময়কে প্রত্যক্ষ করিয়া কি অপার আনন্দ অনুভব করিব না? এইত জীবনের ফল লাভ। শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া আমাদের কি এ শিক্ষা হইবে না?

আর সমাধিক্ষেত্রে ভ্রমণ করিলেও অপূর্ব্ব শিক্ষা লাভ ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। কি নিস্তব্ধতা কি গাম্ভীর্য্য তথায় প্রবেশ মাত্রই অনুভব করিতে পারিবে। তত্রস্থ বৃক্ষ সকল বায়ু দ্বারা মর্ম্মরিত হইয়া যেন মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, তোমার হৃদয় তাহাদের সহিত শোকে একবারেই মিলিয়া যাইবে। আরোই দেখিতে পাইবে এই স্থানে আসিলেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক সকল এক সমতল ভূমিতেই শয়ান রহিয়াছে। কি রাজা কি প্রজা, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি সুন্দর, কি কদর্য্য, কি শত্রু, কি মিত্র, কি সবল, কি দুর্ব্বল, কি পুরোহিত, কি যোদ্ধা সকলেরই অস্থি মাংস এক সাধারণ পিণ্ডাকারে একীভূত হইয়া গিয়াছে। কত অগণ্য সমাধি-মন্দির এবং মৃত ব্যক্তিদিগের বিবরণ সহ কত প্রস্তরফলক তুমি তথায় দেখিতে পাইবে। মৃত্যুর দিন স্থির নাই, ইহা আমরা কেবল শ্রবণ ও পাঠ করি; কিন্তু এখানে ঐ প্রস্তর-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, কেহ এক বৎসরে, কেহ দুই বৎসরে, কেহ তিন বৎসরে, কেহ যৌবনে, কেহ প্রৌঢ়ে, কেহ বা বৃদ্ধাবস্থায় মরিয়াছে। ইহাতে মরণের অবধারিত কাল নাই, এই জ্ঞান তোমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুর মৃত্যুতে তাহার পিতা মাতা কত শোকসূচক কথাই সমাধি-ক্ষেত্রের প্রস্তর-ফলকে লিখাইয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে তোমার কঠিন হৃদয়ও কোমল হইবে; চক্ষে জল আসিবে। কিছুক্ষণ পরে ঐ শিশুর পিতারই সমাধি-মন্দিরের প্রস্তর-ফলক পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবে, শোক তাপ অনিবার্য্য হইলেও তাহা বৃথা। এবং এ কথাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিবে, মৃত পুত্রের পিঠে পিঠেই আমাদিগকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। এই যে ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজাকেও বলিদান দিয়াছিল, তাহার সমাধি-মন্দির ঐ নিহত রাজার সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বেই দেখিতে পাইবে; ইহাতে বুঝিতে পারিবে, ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া যাহারা দ্বেষ হিংসার বশীভূত হইয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা কি মহা মোহে মুগ্ধ, কি নররূপী পিশাচ!! কি ঘোরতর দণ্ডই তাহাদের জন্য পরলোকে অপেক্ষা করিতেছে। কোন কোনে সমাধি-মন্দিরে তুমি শুনিতে পাইবে, কে যেন কবরের ভিতর ইহাও বলিতেছে, "কেন তুমি আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছ—কেন এত ব্যাকুল, আমি আবার তোমার সহিত আনন্দধামে মিলিত হইব। কোন প্রস্তর-ফলকের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত বিবরণগুলি কালবশে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একবারে পাঠের অযোগ্য হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিবে, সমাধি-মন্দির স্থাপন করিয়া চির দিন যশ ও নাম রক্ষার আশা, আশা মাত্র। তাহা চিরদিন ফলোপধায়ক হয় না। এইরূপ সমাধি-

মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হয়ত একদিন তোমার এ রূপও ঘটিবে, যে তখন তুমি আত্মহারা হইয়া যাইবে—তোমার নিজ শরীরকে তুমি ভুলিয়া যাইবে, এই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নিত্য যে ঈশ্বর তাঁহারি স্মরণরূপ সমাধি-মন্দিরে তোমার আত্মা স্থির হইয়া স্থিতি করিবে, তখন—

"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ ॥"

এই শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য তোমার হৃদ্গত হইবে। তুমি বিষয়-বৈরাগ্যের সাহায্যে পরব্রহ্মে তন্ময় হইয়া দুর্ল্লভ ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া আপ্তকাম হইবে। ইহা অপেক্ষা সমাধি-ক্ষেত্রে ভ্রমণের ফল আর কি হইতে পারে? অতএব সেই মহাজ্ঞানীর কথাই সত্য, বৈরাগ্য লাভের উদ্দেশে যিনি বলিয়াছিলেন, "হে জীব! শেষ দিনের উপর তোমার চক্ষুঃ স্থির রাখ"।

হে চির দিনের ধন অক্ষয় ধন। তুমি কোথায়, তুমি আমাদিগকে দেখা দেও। এই অনিত্য সংসারের আসক্তি-রূপ লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কি যাতনাই পাইতেছি। আর যাতনা সহে না, তুমি তোমার কৃপা-হস্তে সে শৃঙ্খল ছিন্ন কর। কত দুঃখতাপ কত বিরহ বেদনায় অস্থির হইয়াছি। কোথা শান্তস্বরূপ—শান্তি-সমুদ্র! আমাকে তুমি তথায় চির-মগ্ন কর। তোমার আনন্দে আমাকে ভাসাইয়া দাও। এই শোকাশ্রুকে আনন্দ অশ্রুতে পরিণত কর। আমি তোমাতে চির দিনের জন্য প্রবেশ করি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর। কোথা নাথ! তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অদ্বৈত মতের সমালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন —

"এবং স্বানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিৎ তদ্বৎ দিনান্তরে!"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একই সম্বিৎ যেমন একদিনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি তাহা দিনান্তরেরও সাক্ষী। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে একা কেবল স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। ইহার পরেই বলিতেছেন "ইয়ং আত্মা" এই সম্বিৎই আত্মা। পঞ্চদশীর এই কথাটি Hamilton বলিতে বলিতে রহিয়া গিয়াছেন। Hamilton বলিতেছেন—

The next term to be considered is conscious subject. And first what is it to be conscious? ·········This act is of the most elementary character; it is the condition of all knowledge ········· I know, I desire, feel. What is it that is common to all these? knowing and feeling and desiring are not the same, and may be distinguished. But they all agree in one fundamental condition. Can I know without knowing that I know? can I desire without knowing that I desire? can I feel without knowing that I feel? this is impossible. Now this knowing that I know or desire or feel, this common condition of self-knowledge, is precisely what is denominated consciousness. Hamilton এইরূপ সম্বিৎকে জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সাধারণ ভিত্তিমূল জানিয়াও সাহস করিয়া এরূপ কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই

যে, সম্বিৎই আত্মা। প্রত্যুত তিনি বলিয়াছেন যে—

Though consciousness be the condition of all internal phenomena, still it is itself only a phenomenon; and therefore supposes a subject in which it inheres;—that is supposes some thing that 'is conscious,—something thrt manifests itself as conscious। কিন্তু পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সেই যে something that is conscious, সেটা canscíousness itself, সেটা সম্বিৎ স্বয়ং।

পঞ্চদশী Hamilton এর ন্যায় সম্বিৎকে আত্মার পরিবর্ত্তনশীল অবভাস মাত্র, phenomenon মাত্র, বলেন নাইঃ—পঞ্চদশী সম্বিৎকে অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, একাকী কেবল স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। স্বয়ংপ্রভা শব্দের অর্থ কি? তাহার অর্থ বলিতেছি শ্রবণ করুন। দীপালোক যেমন আলোক তো আছেই, তা ছাড়া তাহা আপনার আলোকে আপনি আলোকিত অথবা যাহা একই কথা—আপনার আপনি আলোকয়িতা; এইরূপ, যেমন তাহা আলোক, আলোকিত এবং আলোকয়িতা তিনই একাধারে; তেমনি, সম্বিৎ জ্ঞান তো আছেই—তা ছাড়া তাহা আপনি আপনার জ্ঞাত—আপনি আপনার জ্ঞাতা;—কেননা সম্বিৎ আপনার অজ্ঞাত-সারে কিছুই করে না—সম্বিৎ সর্ব্বদাই আপনার জ্ঞানালোকে বিরাজমান; সম্বিৎ স্বয়ম্প্রভা। মুখে বলিতেছি আত্মা, মনে ভাবিতেছি জড়পিণ্ডের ন্যায় একটা অজ্ঞান-পদার্থ অথবা আকর্ষণ-শক্তির ন্যায় একটা অন্ধশক্তি—এরূপ ইতস্তত-ভাব আমাদের দেশীয় পুরাতন দর্শনকারদিগের ত্রিসীমার মধ্যে ঘেঁসিতে পাইত না। সাজানো কথা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। ভাবিবার সময় তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের সব দিক্ সমীচীন-রূপে ভাবিতেন; আর প্রকাশ করিয়া বলিবার সময় তাঁহারা তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় পষ্টাপষ্টি অসঙ্কোচে বলিতেন; লোকে কে কি ভাবিবে—কে কি বলিবে—তাহার কোনো তক্কা রাখিতেন না। যিনি নিরীশ্বরবাদী তিনি একেবারেই নির্ঘাত বলিয়া দিলেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ঈশ্বরের প্রমাণ নাই; Mill পর্য্যন্ত এরূপ তীব্র কথা বলিতে সাহস করেন নাই। যিনি অদ্বৈতবাদী তিনি একেবারেই সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া বলিলেন "সোঽহং"—জর্ম্মান দর্শনকারদিগের প্রপিতামহ Spinoza এরূপ কথা বলিতে সাহস করা দূরে থাকুক্—ওরূপ কথা সহসা কাহারো মুখে শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া যাইত! আপনারা শুনিলে অবাক্ হইবেন যে, গৌতমের প্রণীত ন্যায়-শাস্ত্রের গোড়াতেই দেবতা-বন্দনা হ'চ্চে "ওঁ নমঃ প্রমাণায়" প্রমাণকে নমস্কার করি। একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের কিছুই অসাধ্য নাই, তাঁহারা হয় তো বলিবেন যে "প্রমাণায়" অর্থাৎ যাঁহার প্রকৃষ্টরূপে মান আছে তস্মৈ—অর্থাৎ কিনা যাঁহাকে সকলের আগে বন্দনা করা হয় তস্মৈ—অর্থাৎ কিনা গণেশায়। নমঃ প্রমাণায় কিনা নমো গণেশায়! সে কথা যা'ক্! Hamilton বলিয়াছেন Consciousness জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা সমস্তেরই সাধারণ ভিত্তি মূল বটে—কিন্তু;—ইত্যাদি; কিন্তু পাত-

ঞ্জলের গ্রন্থ মধ্যে এই যে একটি সূত্র আছে

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তু-শূন্যো বিকল্পঃ"

ইহার মধ্যে বটেও নাই কিন্তুও নাই। উহার অর্থ এই ;—শব্দ উচ্চারণের পিছনে পিছনে যে এক প্রকার অর্থশূন্য জ্ঞান উদ্বোধিত হয় তাহারই নাম বিকল্প। সে কিরূপ ? টীকাকার ভোজরাজ বলিতেছেন "যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপং" ইত্যত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতিবৎ শব্দজনিতে জ্ঞানে বোঽধ্যবসিতো ভেদস্তমিহাবিদ্যমানমপি সমারোপ্য বর্ত্ততেঽধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেব পুরুষঃ।" না যেমন, চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ-লক্ষণ, এই কথাটিতে দেবদত্তের কম্বলের ন্যায় পুরুষের মধ্যে এবং চৈতন্যের মধ্যে মিথ্যা একটা ভেদ আরোপিত হয় ;—বাস্তবিক চৈতন্যই পুরুষ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'দেবদত্তের কম্বল' বলিলে যেমন দেবদত্ত মনুষ্য এবং তাহার গায়ের কম্বল একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, এইরূপ বুঝায়, তেমনি "আত্মার চৈতন্য" এরূপ বলিলে বুঝায় যে, আত্মা যেন চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র আর একটা কিছু। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, চৈতন্যই আত্মা। পঞ্চদশী যাহাকে বলিতেছেন সম্বিৎ, যোগ শাস্ত্রে তাহা প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ চেতনা শব্দের অর্থ টীকাতে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এই :—

"বিষয়প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখমঞ্চতি যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ সা প্রত্যক্ চেতনা"

বিষয়ের প্রতিকূলে অন্তঃকরণের অভিমুখে যাহার গতি, এমন যে চেতনা কিনা দৃক্‌শক্তি কিনা জ্ঞান-শক্তি বা ধীশক্তি, তাহাই প্রত্যক্ চেতনা। প্রত্যক্ শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ অন্তর্মুখী, ইংরাজি অনুবাদ subjective। ইউরোপীয় দর্শনের subjective এবং objective শব্দ-যুগলের অবিকল সংস্কৃত প্রতিশব্দ যদি আপনাদের কাহারো কখনো আবশ্যক হয়—তবে subjective এর স্থলে প্রত্যক অথবা প্রতীচীন শব্দ এবং objective এর স্থলে পরাক অথবা পরাচীন শব্দ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন—তাহাতে অভিপ্রেত অর্থের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না। পঞ্চদশী এই প্রত্যক চেতনাকে—সম্বিৎকে—লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "ইয়ং আত্মা" ইনিই আত্মা। প্রত্যক চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তিই আত্মা, এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্যটি ইংরাজি ভাষায় অতীব সহজে এক কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে,—সে কথা এই যে, আত্মা is not a dead substance but a living intellegent power। যোগশাস্ত্রোক্ত প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তিও যা, আর, পঞ্চদশীর সম্বিৎও তাই, একই। পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ
মা ন ভূবংহি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥"

এই যে সম্বিৎরূপী—সাক্ষীরূপী—আত্মা, ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ যেহেতু ইনি পরম প্রেমাস্পদ। আত্মা যে আপনি আপনার প্রেমাস্পদ তাহার প্রমাণ কি ? না "মা ন ভূবং হি ভূয়াসং ইতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে" "আমি না হই" ইহা কাহারো ইচ্ছা নহে, "আমি হই" ইহা সকলেরই ইচ্ছা—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মা আপনি আপনার প্রেমাস্পদ। আত্মা শুধু যে আপনার প্রেমাস্পদ তাহা নহে—আত্মা আপনার পরম প্রেমাস্পদ। কিসে জানিলে ? পঞ্চদশী বলিতেছেন "তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি। অতস্তৎ পরমং" সে প্রেম আপনার জন্য অন্যেতে

সঞ্চারিত হয়—অন্যের জন্য আপনাতে সঞ্চারিত হয় না—এই জন্য তাহা পরম শব্দের বাচ্য। পঞ্চদশীর এই কথাটির কিঞ্চিৎ টীকা আবশ্যক। আমাদের প্রতি-জনের আপনার শরীরের প্রতি অথবা বিষয়-বিভবের প্রতি অথবা মান সম্ভ্রমের প্রতি যে, টান আছে তাহার আতিশয্য হইলেই তাহাকে আমরা বলি স্বার্থপরতা। কিন্তু এখানে সেরূপ গৌণ আত্মপ্রীতির কথা হইতেছে না, এখানে মুখ্য আত্ম-প্রীতির কথা হইতেছে। আপনার সিন্ধু-কের টাকাকে অথবা আপনার উদরকে যিনি আত্ম-তুল্য দেখেন—সেই টাকাকে বা উদরকে ভালবাসাই তাঁহার আত্মপ্রীতি; সেরূপ আত্মপ্রীতির কথা এখানে হইতেছে না; সম্বিৎ-রূপী আত্মার যে আপনার প্রতি আপনার প্রেম তাহাই এখানে আত্মপ্রেম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। টাকা কড়ি লইয়াই, মানাভিমান লইয়াই, মনুষ্যে মনুষ্যে অমিল হয়; কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনা লইয়া কাহারো সহিত কাহারো অমিল হয় না। অমিল দূরে থাকুক—বিশুদ্ধ চেতনার আপনার প্রতি আপনার ভালবাসার ভিতরে সমস্ত জগতের প্রতি ভাল বাসা সম্মুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ এই কথাটির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী তাহার পরেই বলিতেছেন "তেন পরমা-নন্দতাত্মনঃ" তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এ কথাটির তাৎপর্য্য আর একটু স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলা উচিত ছিল। যাহা পরম প্রেমাস্পদ তাহাই কি আনন্দ স্বরূপ? দেবদত্ত আমার পরম প্রেমাস্পদ হইলেও এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, দেবদত্ত বিষাদে ম্রিয়মান। মানিলাম যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ কিন্তু তাহা হইতেই কিছু আর এটা আ-সিতেছে না যে, আত্মা পরম আনন্দ স্ব-রূপ। এ স্থলটিতে পঞ্চদশীর হইয়া আমাকে কিঞ্চিৎ ওকালতি করিতে হইল। তুমি যদি আমার পরম প্রেমাস্পদ হও, আর, তোমাকে যদি আমি নিকটে পাই তবে অবশ্যই আমার আনন্দ হইবে। আত্মা যেমন আপনাকে আপনি সর্ব্বা-পেক্ষা ভালবাসে, তেমনি আপনি আপ-নার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম। তবেই দাঁড়া-তেছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমাস্পদ বন্ধুর নিকটতম সহবাসে যেরূপ পরম আনন্দ হয়—আত্মা কখনই সে আনন্দে বঞ্চিত হইতে পারে না। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন—

> "ইত্থং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধং।
> পরব্রহ্ম তয়োশ্চৈকং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥"

এইরূপ যুক্তি-দ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মা সৎচিৎ এবং পরমানন্দ; আত্মা যে সৎ তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; দেখানো হইয়াছে যে,

> "মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা
> নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—এক কেবল স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। সম্বিৎ অপরিবর্ত্তনীয় সত্য, আর অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বলিয়া তাহা সৎশব্দের বাচ্য। দেখানো হইয়াছে যে, সম্বিৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি তিন অবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সাক্ষীরূপে নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া থাকে। সম্বিৎ যেমন সৎ তেমনি চিৎ। আর, কিয়ৎপূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে যে, সম্বিৎই আত্মা, আর সেই আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ, অতএব পরম

আনন্দস্বরূপ। আত্মা যেমন সৎ, তেমনি চিৎ, তেমনি পরম আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং উভয়ের ঐক্য বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চদশী অতঃপর যাহা বলিতেছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ ইহাও সত্য, আর, আপনি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ইহাও সত্য; কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহা আপনার নিকটে অপ্রকাশ থাকিতে পারে; অপ্রকাশ থাকিলে আত্মা আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়াও নিকটবর্ত্তী নহে। কাজেই সে অবস্থায়—অপ্রকাশ অবস্থায়—আত্মার আনন্দ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। মনে কর যে, আমার বাড়ির ভিত্তিমূলে রত্নের খনি রহিয়াছে কিন্তু আমার নিকট তাহা অপ্রকাশ। তাহা আমার নিকটে প্রকাশ পাইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না; কিন্তু এখন আমি সে আনন্দে বঞ্চিত। একদিকে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে আত্মা কিছু না কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাই কেহই এরূপ ইচ্ছা করে না যে, আমি যেন না থাকি, প্রত্যুত সকলেই এইরূপ ইচ্ছা করে যে, আমি যেন থাকি। আর একদিকে দেখা যায় যে, আত্মা যদি মনুষ্যের নিকটে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইত তবে তাহার বিষয়-স্পৃহা থাকিত না। কোহিনুর হস্তে পাইলে কে অন্য ধনের প্রয়াসী হয়। পরম আনন্দ হস্তে পাইলে কে অপর আনন্দের প্রয়াসী হয়? মনুষ্যের নিকট আত্মা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে মনুষ্য তাহারই আনন্দে ভোর হইয়া থাকিত—বিষয়-স্পৃহা তাহার মনের চৌকাট ডিঙাইতে পারিত না। কিন্তু মনুষ্য দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে—আত্মা তাহার পরম প্রেমাস্পদ অথচ তাহার বিষয়-স্পৃহা ভরপুর। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, আত্মা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। পঞ্চদশী তাই বলিতেছেন

অভাণে ন পরং প্রেম ভাণে ন বিষয়-স্পৃহা।
অতো ভাণেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥

"অভাণে" অর্থাৎ অপ্রকাশে "ন পরং প্রেম" পরম প্রেম হইতে পারে না; "ভাণে" প্রকাশে "ন বিষয়স্পৃহা' বিষয়ের প্রতি স্পৃহা হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের দুইই আছে;—যাহা কেবল প্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাও আছে—আপনার প্রতি পরম প্রেম আছে; আর, যাহা কেবল অপ্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাও আছে—বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট স্পৃহা আছে;

"অতো ভাণেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥"

অতএব আত্মার পরমানন্দতা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। সে কিরূপ? পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ
ভাণেঽপ্যভাণং ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে॥"

নানা সহাধ্যায়ীর সঙ্গে আমার পুত্র যখন বেদ-পাঠ করিতেছে তখন সেই সমবেত পাঠধ্বনির সঙ্গে আমার পুত্রের কণ্ঠধ্বনিও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। এ অবস্থায় আমার পুত্রের কণ্ঠধ্বনি আমি শুনিতেছি তাহাতে আর ভুল নাই কিন্তু কোন্ ধ্বনিটি আমার পুত্রের কণ্ঠ-নিঃসৃত তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবেই হইতেছে যে, আমার সেই পুত্রের কণ্ঠধ্বনি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ না পাইবার কারণ কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ভাণেঽপ্যভাণং ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥"

ভাণেঽপ্যভাণং অর্থাৎ প্রকাশেও অপ্রকাশ "ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে" প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্তই সম্ভবে। একেবারেই না থাকা স্বতন্ত্র, আর প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ স্ফূর্ত্তি না পাওয়া স্বতন্ত্র। মনে কর সমান বলবান্ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠেলিয়া কেহ কাহাকেও নড়াইতে পারিতেছে না। নড়াইতে পারাই বলের লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা কেহ বলিতে পারেন না যে, দুই জনের কেহই যখন কাহাকেও নড়াইতে পারিতেছে না, তখন উভয়ের কাহারো শরীরে একবিন্দুও বল নাই। প্রকৃত কথা এই যে, দুই জনেরই শরীরে প্রভূত বল আছে—কেবল প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহা কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না। ইহার কিয়ৎপরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনং।"

বেদপাঠের দৃষ্টান্তস্থলে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত একত্রে পঠনই প্রতিবন্ধের হেতু—এখানে অনাদি অবিদ্যাই বিভ্রান্তির একমাত্র কারণ। তাহার পরে পঞ্চদশী মায়া এবং অবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এইরূপ;

এ পারে জীব, ওপারে ঈশ্বর, মাঝখানে ঐশী শক্তির প্রভাব;—সেই প্রভাব অথবা যাহা একই কথা, প্রকৃতি, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন এই অর্থে তাহা মায়া শব্দের বাচ্য, আর তাহা জীবের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সংসারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায় এই অর্থে তাহা অবিদ্যাশব্দের বাচ্য। তাহার পরে পঞ্চদশী অবিদ্যার তিনটি অবান্তর বিভাগ যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই;—

(১) স্থূল শরীর—ইহা অস্থি মাংস মজ্জা প্রভৃতি ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত এবং ইহা জাগ্রৎ কালে কার্য্যে ব্যাপৃত হয়; (২) সূক্ষ্ম শরীর—ইহা বিজ্ঞানময় কোষ (intellectual function) মানোময় কোষ (animal function) এবং প্রাণময় কোষ (vital function) এই তিনের সঙ্ঘাত; আর, ইহা স্বপ্নকালে স্থূল শরীর হইতে অবসৃত হইয়া স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়; (৩) কারণ শরীর—ইহার অপর নাম আনন্দময় কোষ এবং ইহা সুষুপ্তিকালে সমস্ত দুঃখ শোক হইতে অবসৃত হইয়া আরাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অবিদ্যার এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম অবান্তর বিভাগ প্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী বলিতেছেন

"যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥"

যেমন শর-গাছের বহিঃস্থিত পত্রাবরণের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ এক একটি স্তবক একে একে সরাইয়া অবশেষে তাহার গর্ভ হইতে নূতন কোমল পত্র উদ্ধৃত করা যায়, তেমনি ধীর ব্যক্তিরা স্থূল-সূক্ষ্ম-এবং-কারণ শরীর হইতে আত্মাকে উত্তরোত্তর-ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া পরব্রহ্ম হইয়া যান। তাহার কিয়ৎ পরে পঞ্চদশী তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন

"জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীং।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তাং উচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা ॥"

তামসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া যে-ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ (material cause) এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা মায়া পরিগ্রহ করিয়া যিনি নিমিত্ত কারণ (efficient cause) তিনি তত্ত্বমসি বাক্যের অন্তর্গত তৎশব্দের বাচ্য। ঐশীশক্তি বা মায়াকে পঞ্চদশী

এইরূপ দুই অবয়বে বিবিক্ত করিয়াছেন—প্রথম, নিমিত্ত কারণ—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা মায়া; দ্বিতীয়, উপাদান কারণ—তামসী মায়া। একদিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব জগতে প্রকাশ করিতেছেন; আর একদিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব সমস্তই একেবারে প্রকাশ করেন না—যথা-নিয়মে উত্তরোত্তর-ক্রমে প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই প্রবর্ত্তিত নিয়ম। ঐশী-শক্তিতে প্রকাশের স্ফূর্ত্তি এবং পূর্ণ-প্রকাশের প্রতিবন্ধক এই দুই অবয়বের প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রথমটিকে পঞ্চদশী বলিয়াছেন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণাত্মিকা মায়া এবং দ্বিতীয়টিকে বলিয়াছেন তামসী মায়া। পঞ্চদশীর মতানুসারে, এইরূপ দ্বিমুখী মায়া-দ্বারা কি না ঐশীশক্তি দ্বারা যিনি জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তিনি তৎ শব্দের বাচ্য। এই গেল তত্ত্বমসি শব্দের তৎ। তাহার পরে আসিতেছে

"যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাং।
আদত্তে তৎপরং ব্রহ্ম ত্বংপদেন তদোচ্যতে॥"

"সেই পরব্রহ্ম যখন বাসনা এবং কর্ম্মাদি দ্বারা দূষিতা মলিন-সত্ত্বা মায়া পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি ত্বং শব্দে অভিহিত হ'ন।" বাসনা এবং কর্ম্মাদি দ্বারা দূষিতা মলিন-সত্ত্বা মায়া অর্থাৎ রজোগুণপ্রধানা মায়া—অর্থাৎ জীবের অবিদ্যা যাহার মূলগত ভাব হ'চ্চে রজোগুণ কিনা struggle for existence। এখানে পঞ্চদশী মায়াকে তিন অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) ঐশীশক্তির প্রভাব—যাহার মূলগত ভাব প্রকাশ; (২) ঐশীশক্তির নিয়ম—যাহা ঐশ্বরিক ভাবের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক; (৩) জীবের অভ্যন্তরে ঐশীশক্তির বিচেষ্টা—যাহার স্থূল দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে;—তাহা আর কিছু না—Darwin যাহাকে বলেন struggle for existence।

ক্রমশঃ।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সুন্দরকাণ্ড।

গতবারের পত্রিকায় বাল্মীকি রামায়ণ হইতে আমরা দেখাইয়াছি যে সুন্দরকাণ্ডের ভিতরেও রামচন্দ্রের অবতারত্ব সম্বন্ধে কিছুই নাই। কিন্তু অধ্যাত্ম-রামায়ণে এতৎ সম্বন্ধে যে বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বাপর দেখাইয়া আসিতেছি। এই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অধ্যাত্মরামায়ণকার সত্যের সহিত সুমিষ্ট কল্পনা মিশ্রিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই শেষোক্ত রামায়ণের ঐ কাণ্ড হইতে পল্লবিত বাহুল্যাংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্ব প্রকাশিতের সহিত বর্ত্তমান প্রস্তাব মিলাইয়া পড়েন, পাঠকদিগের নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ।

১। লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হনুমান কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া কহিলেন, হনূমান! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি লঙ্কা জয় করিবে। পুরাকালে ব্রহ্মা আমার নিকটে বলিয়াছিলেন, যে অবিনাশী নারায়ণ ত্রেতাযুগে ভূভার হরণের জন্য দশরথ গৃহে ও যোগমায়া সীতারূপে জনকগৃহে অবতীর্ণ হইবেন। ভার্য্যা ও অনুজের সহিত রামচন্দ্র মহাবনে গমন করিবেন। রাবণ মহামায়া সীতাকে অপহরণ করিবেন। স্বয়ং লঙ্কা আমি যখন তোমার নিকট পরাজিত হইলাম তখন বিজয়শ্রী তোমার অঙ্কগত। দেখ,

বহুকালের পর রামচন্দ্র আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছেন; শ্রীরামকে স্মরণ করিলে সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, আমি আজ ধন্যা হইলাম। হনুমান! তুমি রামের ভক্ত, তোমার সংসর্গও অতিদুর্লভ, তাহাও লাভ হইল। এক্ষণে দশরথনন্দন প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করুন।

ধন্যাহমপ্যদ্য চিরায় রাঘব
স্মৃতিমার্গাসীত্তবপাশমোচনী।
তদ্ভক্তসঙ্গোহপ্যতিদুর্লভোমম
প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি।
১ম অ। ৫৭ শ্লোক।

২। হনুমান শিংশপা বৃক্ষে লুক্কায়িত আছেন, রাবণ সীতার উদ্দেশে অশোক বনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন ও ভাবিতেছেন "রাঘবেনাশু মরণং মে কথং ভবেৎ" রামের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে কিরূপে; রাম সীতা উদ্ধারের জন্য কেন আসিতেছেন না। এইরূপে রাবণ অনবরত রামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, ও বলিলেন স্বপ্নযোগে দেখিয়াছি এক কামরূপী বানর সমুদ্র পার হইয়া অদৃশ্যভাবে বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া সীতাকে দেখিতেছে। যদি তাহাই হয় সীতাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করি; বানর তাহা দেখিয়া গিয়া রামকে উত্তেজিত করুক। সুন্দরকাণ্ড। ২য় অধ্যায়

৩। হনুমান মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্রবলে আবদ্ধ হইয়া রাবণ-সভায় নীত হইলে কহিলেন, ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র স্পর্শমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তথাপি, রাবণ! আমি দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া তোমাকে হিতোপদেশ দিবার জন্য বন্ধের ন্যায় আসিয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণ, রাক্ষস নহ, তোমাকে মুক্তির উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর

বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়
স্ততোভবেজ্জ্ঞানমতীব নির্ম্মলং
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ
সম্যগ্বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ।
অতোভজস্বাদ্য হরিং রমাপতিং
রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভুং,
বিসৃজ্য মৌর্খ্যং হৃদি শত্রুভাবনাং
ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্।
২২, ২৫ শ্লোক ৪র্থ অধ্যায়।

বিষ্ণুভক্তি হইতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা হইতে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ও পরে বিশুদ্ধতত্ত্ব সম্যকরূপে জানিতে পারিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব পুরাণ-পুরুষ প্রকৃতির অতীত বিভু রমাপতি রামচন্দ্রকে ভজনা কর, মূর্খতা ত্যাগ কর, তাঁহার প্রতি শত্রুতা পরিহার কর, শরণাগত বৎসল রামচন্দ্রকে ভজনা কর।

নোচেৎ ত্বমজ্ঞানময়েন বহ্নিনা
জ্বলন্তমাত্মানমরক্ষিতারিবৎ
নয়স্যধোঽধঃ স্বকৃতৈশ্চ পাতকৈ
র্বিমোক্ষশঙ্কা নচ তে ভবিষ্যতি। ৪র্থ অধ্যায়।

তুমি আপনি আপনার শত্রু হইয়া অজ্ঞানময়-বহ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মাকে নিজকৃত পাপরাশির সাহায্যে অধোগত করিতেছ, তোমার মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

৩। হনুমান সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান লইয়া প্রত্যাগত হইলে রামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, হনুমান! আমি পরমেশ্বর, আমার আলিঙ্গন জগতে দুর্লভ; হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয়, এ কারণ তুমি ইহা প্রাপ্ত হইলে। ৫ অধ্যায়।

বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রের দেবত্ব সম্বন্ধে এ সব কিছুই নাই। পাঠকগণ দেখুন অধ্যাত্ম-রামায়ণকারের লক্ষ্য যে কোন উপায়ে হউক রামের অবতারত্ব সংস্থাপন। মহর্ষি বাল্মীকির সে দিকে দৃষ্টি নাই। তিনি আপনার কবিত্ব লই-

য়াই বিভোর। অধ্যাত্ম-রামায়ণকার কাব্যের রসভঙ্গ করিয়াও অধ্যাত্মতত্ত্ব ঢালিয়া চলিয়াছেন। যাঁহারা অধ্যাত্ম-রামায়ণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, লেখক আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা উত্তেজিত করিয়া কেমন সুকৌশলে শত্রু মিত্র সকলেরই মুখে রামচন্দ্রের অবতারত্ব পরিকীর্ত্তন করিতেছেন। যেখানেই অধ্যাত্ম-রামায়ণকার কর্তৃক স্বকপোলকল্পনার বিমিশ্রণ, সেইখানেই এমন কতকগুলি অলৌকিক মাধুর্য্যময় শ্লোকের সমাবেশে ধর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত, যে পাঠক মন্ত্রমুগ্ধ স্পন্দহীন; তাহার সাধ্য নাই যে ঐগুলির প্রতি ইচ্ছা করিয়া বধির থাকিতে পারেন। একথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। আমরাও অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুরাগী। বিরোধ এই আমরা ঈশ্বরের সিংহাসনে অন্য কাহাকেও প্রাণ ধরিয়া বসাইতে পারি না। আমাদের কথা "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ঈশ্বরের সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। যাঁহারা বলিতে চান ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে অবতার হইয়া নররূপে মর্ত্ত্যে বিচরণ করেন, তাঁহারা দেখুন অবতারঘোষী অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্রাদির জননী প্রাচীন শাস্ত্রে তৎপ্রতিপোষক কোন কথার আদৌ উল্লেখ নাই। অন্ততঃ আমরা বাল্মীকি রামায়ণ পড়িয়া যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে রামচন্দ্রের অবতারত্ব সম্পূর্ণরূপ ভিত্তিহীন। যাঁহারা বলেন অবতারবাদে শাস্ত্রকারগণের গূঢ় অভিপ্রায় (policy) লুক্কায়িত, ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল করিবার পক্ষে ইহা উপযোগী, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আগুণ লইয়া খেলা বড় ভাল নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এত জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চার মধ্যে সুধীর বিদ্বজ্জনের মধ্যেও অবতারবাদের ঘোর কাটিতেছে না। এমন কি কতকগুলি মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিও অবতারবাদ সংস্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা সাধারণকে বুঝাইতে চাহেন যে অবতার হওয়া ঈশ্বরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমরা নিজে তাঁহাদের কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া শ্রীমৎ ব্যাসদেবের সর্ব্বজনবিদিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাহখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বং চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং।

তুমি, রূপবিবর্জ্জিত ধ্যানের দ্বারা আমি যে তোমার রূপ বর্ণনা করিয়াছি, তোমার অনির্ব্বচনীয়ত্ব আমি যে স্তুতিবাদ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছি, তীর্থযাত্রা দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপিত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি, হে জগদীশ! আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর। ঈশ্বরের অবতারত্ব-সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে।

বাল্মীকি রামায়ণে হনূমান অঙ্গদ রাক্ষসাদির চিত্র যে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে তাহা রক্ষিত হয় নাই। আমরা মূল রামায়ণে দেখিয়াছি হনূমান কি বীর্য্যে কি শৌর্য্যে কি রাজনীতিজ্ঞতায় কি বাক্‌পটুতায় কি কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় অতুলন। হনূমান ও অঙ্গদাদির সাহায্য না পাইলে রামের স্বচেষ্টায় যে সীতা উদ্ধার হইত না, পাঠকগণ লঙ্কাকাণ্ডে তাহার পরিচয় পাইবেন। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ পাঠে ও পিতামহীর মুখে গল্প শ্রবণে রামায়ণ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে হনূমান

প্রকৃতপক্ষেই জন্তুবিশেষ। রাক্ষসগণও ঐ ভাবের এক ভীষণ জীব। প্রকৃত পক্ষে রামায়ণে রাক্ষসগণের মধ্যে সভ্যতা ও শিল্পচাতুর্য্যের যে অভ্যুদয় দেখিতে পাই, তাহার নিকট বর্ত্তমান কালের সুসভ্য রাজধানীর শ্রী সমৃদ্ধিও ম্লান হইয়া যায়। আমরা যতটুকু বুঝি তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারি রামায়ণ রচনার কাল এদেশের জ্ঞানোন্নত সময়ের কাল—কাব্য সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশের সময়। অধ্যাত্মরামায়ণ রচনার কাল জনসমাজে বৈদান্তিক ধর্ম্মকে নানা উপায়ে বদ্ধমূল করিবার কাল। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের কাল গল্পচ্ছলে হাস্যামোদের সঙ্গে কৌশলে আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া অন্যমনস্ক জনসমাজকে নীতি ও ধর্ম্মে বাঁধিয়া রাখিবার সময়। বাল্মীকি-রামায়ণের সময় জন-সমাজ নীতি চায় কাব্য চায়, ও তাহা বুঝিবার তাহার সামর্থ্য ছিল। অধ্যাত্মরামায়ণের কালে লোকে বৈদান্তিক ধর্ম্ম চায়, কিন্তু অবিকৃত অবস্থায় বুঝিবার তাহার পূর্ণ সামর্থ ছিল না; একারণ ফলশ্রুতির সহিত অবতারাদির প্রচলন। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের সময়ে দুর্ব্বলমস্তিষ্ক জনসমাজ গল্প শুনিতে চায়, আমোদে উৎফুল্ল হইতে চায়, রহস্য চায়, কিন্তু কঠোর ধর্ম্ম বুঝিবার তাহার ধারণা-শক্তি ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ শেষোক্ত সময়ের রহস্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে দেখি, হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদত্ত হইলে তাহা নির্ব্বাণ হইল না দেখিয়া, সে সীতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—

কেমনে নির্ব্বাণ হবে এই হুতাশন।
সীতা বলে মুখামৃত দেহ হনুমন্ত
নির্ব্বাণ হইবে জ্বালা না রবে একান্ত।
তবে হনু হয়ে অতি জ্বালায় কাতর
জলন্ত লাঙ্গুল পুরে মুখের ভিতর।
নির্ব্বাণ হইল জ্বালা পুড়ে গেল মুখ।
সিন্ধুতীরে গেল হনু মনে পেয়ে দুখ
জলে মুখ দেখে বীর মনাগুণে জ্বলে
পুনরপি জানকী নিকটে আসি বলে।
তব কার্য্যে আসি গো মা পুড়ে গেল মুখ
জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক সে যে বড় দুখ।
সীতাবলে জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া
মমবাক্যে সকলের হবে মুখ পোড়া।

এইখান হইতেই হনুমানের মুখপোড়ার উৎপত্তি। কি আশ্চর্য্য! এ সব কথা না বাল্মীকি রামায়ণে না অধ্যাত্মরামায়ণে আছে। আগামী বারে যুদ্ধকাণ্ড লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বৈশাখোৎসব।

ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব। বৌদ্ধদের বৈশাখোৎসব। মাঘোৎসব ১১ই মাঘে হয়। বৈশাখোৎসব কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে হয় না। হিন্দু পর্ব্বের মত তিথি ধরিয়া উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়। এই নিমিত্ত ইহা বৈশাখোৎসবাখ্যায় আখ্যায়িত। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় সম্প্রদায় অপেক্ষা বৌদ্ধের সংখ্যা অধিক। সুতরাং ধর্ম্ম জগতের অধিকাংশ লোকের উহা উৎসব ও আনন্দের দিন। অন্যান্য দূর দেশের কথা দূরে থাকুক, সিংহলের কথা বলিতেছি। উক্ত দ্বীপে ঐ দিন প্রতিঘরে পতাকা উড্ডীয়মান হয়; দান ধ্যান ধর্ম্মের সদনুষ্ঠান হয়; দুঃখের কালিমা সে দিন অপসৃত হইয়া থাকে; সকলে প্রীতি প্রফুল্ল। তথায় ঐ দিন সমস্ত সরকারি বেসরকারি কার্য্যালয়াদি বন্ধ হইয়া থাকে। ঐ দিনের এত মাহাত্ম্য কিসে? হিন্দুদিগেরও উহা অতি

পবিত্র শুভ মাসের পবিত্রতম শুভতম দিন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক। বুদ্ধদেব ঐ দিন মঙ্গলবার * প্রাতে বিশাখা নক্ষত্রে কপিলবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শুধু তাহা নহে। বৌদ্ধের পক্ষে উহার ত্রিগুণাত্মক বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি মহর্ষি শাক্যসিংহ জন্মপরিগ্রহ করেন, ঐ দিনে। দ্বিতীয়তঃ এই সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী রাজনন্দন বুদ্ধত্ব লাভ করেন, ঐ দিনে। তৃতীয়তঃ বুদ্ধদেব কুশীনগরের মল্ল রাজগণের অধিকৃত শালবনে মঙ্গলবার প্রাতে পরিনির্ব্বাণ † লাভ করেন, ঐ দিনে। এখন বাকি রহিল কাশীধামে তাঁহার প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার। এই ঘটনা তাঁহার পুণ্য জীবনের প্রধান ঘটনা চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম। ইহাই কেবল আষাঢ়ী পূর্ণিমায় হয়। সুতরাং অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান চারি ঘটনার মধ্যে তিনটিই ঐ এক বৈশাখী পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়। বৌদ্ধগণ এই শুভদিনের মাহাত্ম্য যেরূপ উপলব্ধি করিবেন, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে, অন্য কোনও জাতি সেরূপ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

তিব্বতের উৎসবের বিষয় পূর্ব্বে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" লিখিত হইয়াছে। চীন জাপানের উৎসব বিবরণ যদিও কিছু প্রকটিত হয় নাই, তথাপি এতটুকু বলিতে পারি যে, উহা যে তদপেক্ষা কিছু কম সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সম্ভব পর নহে, প্রত্যুত অধিকতর সমারোহে সম্পন্ন হইবারই কথা। ব্রহ্ম ও শ্যাম রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে। শেষোক্তটি স্বাধীন রাজ্য। প্রথমোক্তটি ইংরাজ-অধিকৃত। বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষে, বৌদ্ধ নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাহা কিছু আছে, তাহারা এক্ষণে ইহার এক কোণে চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রদেশে বিদূরিত হইয়া হীনাবস্থায় বাস করিতেছে।

সম্প্রতি নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত নিগ্লাভাগ্রামের বন মধ্যে এক অশোক স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ২৩৬ খৃষ্টের পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত। অশোক ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিতেছেন যে, এইস্থানে কপিলবস্তু নগরস্থ লুম্বিনী উদ্যানে মহাত্মা বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। অতীব আহ্লাদের কথা! অনেক শত বৎসরের পর একটী বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল।

গ্রন্থ সমালোচনা।

আর্য্যালহরী। এই সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন কর্ত্তৃক বিরচিত। তর্করত্ন যে অসাধারণ শক্তি লইয়া জন্মিয়াছেন এই গ্রন্থখানিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইহাতে কবির প্রতিভা ও রচনাচাতুরী দুইই প্রচুররূপে দেখা যায়। তর্করত্ন একালের লোক হইলেও বাসুদেববিজয় প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ তাঁহাকে বহু পূর্ব্বকালের করিয়া তুলিয়াছে। এক সময়ে এদেশের ধনী লোকেরা অত্যন্ত সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা

---

* কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে শুক্রবার।

† পালি ধর্ম্ম গ্রন্থে ইহাকে "খন্দ পরিনির্ব্বাণ" কহে।

করিতেন এবং সংস্কৃতজ্ঞদিগকে দানমানাদি দ্বারা উৎসাহ দিতেন। বর্ত্তমানে সেরূপ ধনী প্রায়ই দেখা যায় না। এ জন্য উৎসাহ দানের অভাবে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা একপ্রকার লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তথাপি দুই একখানা যাহা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় তাহা কেবল গ্রন্থকারদিগের স্বচেষ্টায়। কারণ শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিবার নয়। ইহার উপর ধনীলোকের উৎসাহ দান থাকিলে গ্রন্থের সংখ্যা আরও অধিক দেখিতে পাইতাম। যাহাই হউক আমরা তর্করত্নের গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সুকবির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৯৯৸/০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৫৫৸ ৯
সমষ্টি	...	৯৫৫॥/৯
ব্যয়	...	৩১২ ৶৯
স্থিত	...	৬৪৩।৶০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১৩৬।৶০
	৬৪৩।৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১০০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩১।০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা		১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ ঘোষ ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	ঐ	৪॥০
" " জয়গোপাল সেন,	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায়,	ঐ	৩৲
" " বনমালী চন্দ্র,	ঐ	৩৲
" " মতিলাল পাল,	ঐ	৩৲
" " মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড়		৩৲
" " যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বলুহাটী		।৶০
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, কটক		১।৶০
		৩১।০

পুস্তকালয়	...	৫॥/০
যন্ত্রালয়	... ...	১৬২৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৲
সমষ্টি		২৯৯৸/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৬॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮॥৶০
পুস্তকালয়	...	২০৲
যন্ত্রালয়	...	৮৬৸/৯
সমষ্টি	...	৩১২৶৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৪৭ সংখ্যা ১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীমৎ মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব।

যাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ পুণ্য নদী নিঃসৃত হইয়া আজ শাখা প্রশাখায় দিক্‌দিগন্ত প্লাবিত করিতেছে, সংসার-তাপ-দগ্ধ নর নারীদিগকে জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্যই যাঁহার জন্ম, কতশত বিপথগামী ব্যক্তি যাঁহার মর্ম্মস্পর্শী উপদেশে মোহান্ধকারবিমুক্ত ও সত্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, যিনি রোগ-শোক-পরিপূর্ণ মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াও নিত্য কাল ব্রহ্মে সংস্থিত, ব্রহ্মই যাঁহার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল এবং রোগের ঔষধ, আজ সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসব। প্রাতে তাঁহার পরিবারস্থ নর নারী সকলেই ব্রহ্মোপাসনার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। যথা সময়ে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনা করিয়া একটী প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

* আজি এই শুভদিনে এই মধু সমীরণ হিল্লোলযুক্ত প্রাতঃকালে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় নিরবয়ব পরমাত্মা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি। আজ আমাদের এত আনন্দ কেন? যখন ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যখন শত শত নর নারীর ক্রন্দনধ্বনিতে সমগ্র ভারত শব্দায়মান হইতেছে, তখন আমাদের এত আনন্দ কেন? যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ আসিয়া, আমাদের মোহাচ্ছন্ন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন আজ সেই আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জন্মদিন। আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই। আজ পিতৃদেবের অশীতি বৎসর পূর্ণ হইল। এই অশীতি বৎসর ইনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু হায়! আমরা এতই নির্ব্বোধ, আমাদের এতই দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের সুহৃদ্ ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখনও প্রত্যক্ষ রূপে বুঝিতে সমর্থ হই নাই। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের মধ্যে এতকাল বাস করিয়া সর্ব্বদাই আমাদিগকে দুর্গতি হইতে

* আচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত।

রক্ষা করিতেছে, তাহাকে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ না করিয়া, অবহেলা করিতেছি!

হে পিতৃদেব! আমরা তোমার নিকট চির ঋণে আবদ্ধ আছি, তুমি আমাদিগকে দুর্গম পথ হইতে সুগম পথ প্রদর্শন করাইয়া দিয়াছ কিন্তু আমরা এতই অন্ধ যে সে পথ আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না। তোমার যে অপার স্নেহ-ঋণে আমরা বদ্ধ আছি, তাহা কখনই শোধ করিতে পারিব না। হে পিতৃদেব! আমাদের উপর এই আশীর্ব্বাদ কর যাহাতে আমরা তোমার বাক্য অনুসরণ করিতে পারি এবং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ অনুসারে চলিয়া ইহলোকে সুখী হইয়া পরলোকে সুগতি লাভ করিতে পারি। তুমি এই আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বর্ষণ কর।

হে জগদীশ্বর! তোমার কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে, যাহাতে পিতৃদেব আমাদের মধ্যে আরও দীর্ঘকাল থাকিয়া আমাদিগকে তোমাকে জানিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন তুমি তাহা কর! হে দেবাদিদেব! তুমি দেখিতেছ, আমাদের প্রতিপদে পদস্খলন হইতেছে। আমাদের এ দুর্ব্বলতা দুর কর এবং তোমার পথে আমাদিগকে লইয়া যাও! তুমি আমাদের আপনার হইতেও আপনার। আমরা পিতা মাতাকে দেখিতেছি কিন্তু পিতা মাতা হইতেও আপনার যে তুমি তোমাকে এখনও আমরা দেখিতে সমর্থ নহি। আমাদিগকে শুভমতি দাও! এবং পদে পদে আমাদিগকে সংসারের দুর্গম বাধা বিঘ্ন হইতে দূরে রাখ! এবং যাহা অসার তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া যাহা সার তাহা যাহাতে গ্রহণ করিতে পারি সেই ক্ষমতা আমাদিগকে দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তোমরা সকলে একত্র হইয়া সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া এই দিনকে যে পবিত্র করিলে, ইহা আমার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। আমার শুষ্কজীবনে আজ জীবন প্রবাহ প্রবাহিত হইল। যিনি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি, অমৃতের নেতা, তিনি তোমাদিগকে তাঁহার মঙ্গল পথে—পুণ্যপথে উন্নত করুন, এই সুখ দুঃখময় সংসারে তোমাদিগকে বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করুন, তোমাদের সৌভাগ্য সুখ বিধান করুন। এবং তিনি তাঁহার প্রতি তোমাদের প্রেমভক্তি উজ্জ্বল করুন। তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার এই স্নেহময় মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ। ওঁ শুভমস্তু।

পরে তিনি উপবিষ্ট হইলে সকলে তাঁহাকে পুষ্পোপহার দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ের সেই স্বর্গীয় দৃশ্য যাঁহারা চক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহারা এই জন্মোৎসবের মধুরতা কিছুই অনুভব করিতে পারিবেন না। মধ্যে প্রশস্তললাট বিশালবক্ষ জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ উপবিষ্ট, আর তাঁহারই পুত্র পৌত্রাদি বহু পরিবার—সুরূপ ও সদ্গুণের বিদ্যা ও বুদ্ধির আদর্শস্থল বহু পরিবার বিবিধ পুষ্প উপহার দিয়া ভক্তিভরে একে একে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিতেছেন তৎকালে এই দৃশ্য বড়ই হৃদয়হারী হইয়াছিল। কিন্তু এই স্বর্গের দেবতা পৃথিবীতে আর কতকাল থাকিবেন এই ভাবিয়া অনেকেরই মন অত্যন্ত কাতরও হইয়াছিল।

ঐ দিনে সময়ান্তরে শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব স্বরচিত এই কএকটী শ্লোক মহর্ষিদেবকে উপহার দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

ওঁ তৎসৎ।

সুগৃহীতনামধেয়-শ্রীমদ্ভগবৎপূজ্যপাদ-মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথস্য পাদপদ্মে তস্য একাশীতিবর্ষীয় শুভজন্মবাসরোৎসবে ভক্তিপুষ্পোপহারঃ।

১

কুলে প্রসূতো মহতাং মহোচ্চৈঃ
সংস্তূয়মানো গুণিভিঃ সদৈব।
অশেষসংসারসুখাব্ধিমগ্নঃ
সৌভাগ্যলক্ষ্যাশ্রিতপাদপদ্মঃ॥

২

কদাচিদাত্মীয়জনস্য মৃত্যুং
দৃষ্ট্বা বিবুদ্ধঃ সহসা বিচার্য্য।
অসারসংসার-বিনশ্বরত্বং
যো বীতরাগস্তরুণোঽপি জাতঃ॥

৩

অধ্যাত্মশাস্ত্রাম্বুনিধিং বিলোড্য
স্ববুদ্ধিমন্থানবলেন ধীরঃ।
ব্রহ্মামৃতং সত্যমনন্তমেকং
সমুদ্ধধারাখিললোকভূত্যৈ॥

৪

যস্যোপদেশাঃ পরমার্থপূর্ণাঃ
পুনন্তি লোকান্ দুরিতাদশেষাৎ।
যজ্জীবনং সৎপথদর্শকং নঃ
তং পূজ্যদেবং প্রণতোঽভিবন্দে॥

৫

আজন্মশুদ্ধস্য সমর্চ্চ্যমূর্ত্তেঃ
তস্যৈব দেবস্য পবিত্রকীর্ত্তেঃ।
জন্মোৎসবো জ্ঞানদৃশো মহর্ষেঃ
দেবেন্দ্রনাথস্য সুমঙ্গলোঽস্তু॥

৬

যো জন্মাবধিধর্ম্মকর্ম্মনিরতঃ সত্যাশ্রয়স্তত্ত্ববিৎ
ধীরো ধীরজনার্চ্চিতঃ ক্ষিতিতলে ধন্যঃ সতামগ্রণীঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিতরাং দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ খ্যাতো মহাত্মা মুনিঃ
ব্রহ্মানন্দসুধাম্বুধৌ নিরুপমে সংগাহমানঃ সুধীঃ।

৭

নানাবিঘ্নবিপর্য্যয়ান্ প্রশময়ন্ যঃ সত্যধর্ম্মধ্বজম্
সংস্থাপ্যাত্রভবান্ বিভুঃ সুমনসামপ্রাপদভ্যর্চ্চনাম্।
স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স মহান্ নিষ্কামকর্ম্মান্বিতঃ
শান্তাত্মাখিললোকশোকহরণো জীয়াচ্চিরং ক্ষ্মাতলে॥

৮

হে সৌম্যমূর্ত্তে! করুণার্দ্রচেতঃ!
পরার্দ্ধ্যজন্মন্! সুমহন্! মহর্ষে!
দীনোপহারং সুমহোৎসবেঽস্য
গৃহাণ তু সানুগ্রহমাশ্রিতস্য॥

জ্যৈষ্ঠস্য তৃতীয়দিবসঃ। শকাব্দা ১৮১৯। — প্রণতস্য শ্রীশিবধন শর্ম্মণঃ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮। ২১ এ ফাল্গুন, বুধবার।

প্রফুল্লতা।

বহুকাল পূর্ব্বে কোন এক সাধু তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, হে বৎস, তুমি শান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিবে, অত্যন্ত দুরবস্থার সময়েও তুমি তাহার ভারে ডুবিয়া যাইও না। আবার যখন সৌভাগ্যের উদয় হইতে থাকিবে, পূর্ণ সৌভাগ্যের তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখনও যেন এক ভয়ঙ্কর অদম্য উল্লাস আসিয়া তোমার মনের স্থির শান্ত ভাব বা সাম্যকে নষ্ট না করে। আমাদের দেশের ঋষিরাও এই সাম্য ভাবের পক্ষপাতী ছিলেন। সাম্যভাবকেই প্রকৃত পক্ষে মনের প্রফুল্লতা বলা যাইতে পারে। উগ্র আমোদ আহ্লাদ উচ্চ ও বিকট হাস্য প্রফুল্লতার চিহ্ন নহে। তীব্র আমোদ অপেক্ষা প্রফুল্লতাকে বিজ্ঞেরা শ্রেষ্ঠ করিয়া বলিয়াছেন। তীব্র আমোদ ক্ষণস্থায়ী প্রফুল্লতা বহুক্ষণস্থায়ী। ইহাকে মনের স্থির

অভ্যাস বলা যাইতে পারে। তীব্র আনন্দ বিদ্যুতেব ন্যায়, ইহা নিমেষ মাত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়াই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রফুল্লতা দিবালোকের ন্যায় স্থির। ইহা মনোমধ্যে শান্তিকে জাগাইয়া রাখে। যাহারা গভীর বিষাদের হ্রদে ডুবিয়া থাকে, তাহারাও সময়ে সময়ে ক্ষণিক আহ্লাদের উচ্চ শিখরে উঠিতে পারে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত প্রফুল্ল ও প্রশান্তচিত্ত, তাহারা যদিও উচ্চহাসি হাসে না, উচ্চ কলরব করে না, আমোদে অস্থির হয় না, কিন্তু তাহারা কখনই শোকের গভীর খাতে নিমগ্ন হয় না।

বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি, তীব্র আমোদ আহ্লাদকে মর্ত্ত্যলোকে আমাদের এ অবস্থার অনুপযোগী বলিয়াই বিবেচনা করেন। যেখানে জীবন যৌবন, ধন মান, সুখ সম্পদ, বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র, এই আছে এই নাই, যেখানে জীবন অনুক্ষণই বিপদে বেষ্টিত, সেখানে উচ্চ কলরব, উচ্চ হাসি, তীব্র আমোদ শোভা পায় না। এই কারণে, সকল দেশের জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোকের চরিত্রে সাম্যভাব বা প্রফুল্লতাই প্রস্ফুটিত থাকে, তাঁহারা কোন কালেই তীব্র আমোদের পক্ষপাতী নহেন।

প্রফুল্লতার সহিত আমাদের তিনটি বিষয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এক আমাদের নিজের সহিত সম্বন্ধ, দ্বিতীয় পরের সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ যাহাদের সহিত আমরা আলাপ বা কথা বার্ত্তা কহি তাহাদের সহিত সম্বন্ধ, তৃতীয় ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহার মনে প্রফুল্লতা আছে, তিনি যে কেবল সদানন্দ তাহা নহে, তিনি আপনার বৃত্তি প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ রূপে কর্ত্তৃত্ব রাখিতে পারেন। তাঁহার কল্পনা-শক্তি পরিষ্কার। বিচারকালে তিনি স্থির বুদ্ধি। কি কার্য্যক্ষেত্রে, কি নির্জ্জনে, তাঁহার প্রকৃতি চাঞ্চল্যবিহীন। ঈশ্বর তাঁহার জন্য যে পবিত্র ভোগের দ্রব্য এখানে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সৃষ্টির শোভায় যে বিশুদ্ধ আনন্দ রাখিয়াছেন, অনায়াসেই তিনি তাহার আস্বাদন করিতে পারেন। দৈব বিপৎপাতের যে পূর্ণ ভার, তাহাও তিনি অপর লোকের ন্যায় তীব্র রূপে অনুভব করেন না।

যাহার সহিত তিনি আলাপ করেন, অতি সহজেই তিনি তাহার প্রেম ও সদিচ্ছা, আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহার আত্মার শোভা তাঁহার মুখমণ্ডলে সর্ব্বক্ষণ বিকীর্ণ থাকে। সেই শোভার এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে, যে তিনি তদ্দ্বারা সকলকেই আপনার করিয়া তুলিতে পারেন। তিনি লোক সকলকে ভালবাসিতে ও বাধিত করিতে যেমন পটু তাহারাও তেমনি তাঁহাকে ভালবাসিতে ও বাধিত করিতে যত্নশীল। যিনি প্রফুল্ল-চিত্ত ব্যক্তির সংসর্গে থাকেন, তিনি তাঁহার নিজের অজ্ঞাতসারেই আনন্দিত হইতে থাকেন। অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় তাঁহার আনন্দস্রোত বহিতে থাকে।

এই প্রফুল্লতাকে এক রূপ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বলা যাইতে পারে। সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় সাম্য অবলম্বনে ঈশ্বরের প্রতি যেমন ভক্তি ও পূজার ভাব প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই পায় না। "দাও দুঃখ দাও তাপ সকলই সহিব আমি, ও হে করুণাময়স্বামী" এ কথা যিনি অন্তরের সহিত বলিতে পারেন, তাঁর মত সংসারজয়ী আর কে আছে? তিনিই যথার্থ প্রফুল্লচিত্ত ও শান্ত স্বরূপের উপাসক।

জ্ঞানিগণ বিবেচনা করেন, কেবল

দুইটিমাত্র বিষয় আছে, যাহা আমাদিগকে ন্যায়সঙ্গত রূপে অন্তরের প্রফুল্ল ভাব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে তন্মধ্যে একটি ক্রিয়মান পাপ। যে ব্যক্তি পাপ হইতে বিরত হয় নাই, যাহার নিমিত্ত সে কিছু মাত্র অনুতপ্ত নহে, সে কখন প্রফুলতা ও সাম্যের সুখ ভোগ করিতে পারে না। এই সাম্যই আত্মার স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্ম ও নিরীহতার পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হয়।

অপরটি নাস্তিকতা। অর্থাৎ ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাস। মৃত্যুর পর আর থাকিতে হইবে না, এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিষাদ ও যন্ত্রণার ভাব আছে, [illegible]রা নাস্তিক সমস্ত জীবনেই অসুখী [illegible] বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া [illegible]্য ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাস করে। [illegible] একমাত্র সত্যস্বরূপ তাঁহাতেই অ-[illegible]াস! জগতে ঈশ্বর ভিন্ন প্রকৃত সত্য [illegible]র নাই। এই সত্য আমরা প্রত্যেক পদার্থে প্রত্যেক ঘটনায় প্রত্যেক চিন্তায় দেখিতে পাই।

আমরা যদি নাস্তিকচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করি, তাহা হইলে ইহাই দেখিতে পাই, যে তাহার মধ্যে কেবল অহঙ্কার বিরক্তি ও অকারণ আপত্তি অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে, যাহারা মনে মনে সর্ব্বদাই অসুখী তাহারা আবার অন্যকে সুখী করিবে কি? যাহারা প্রতিমুহূর্ত্তে আপনাদের অস্তিত্ব হারাইবার ভয়ে ব্যাকুল, তাহাদের নিকটে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে? সুতরাং অননুতপ্ত পাপী ও নাস্তিক, যাহারা যন্ত্রণা ও ভবিষ্য অনস্তিত্বের আশঙ্কায় অস্থির, তাহারা কখন বর্ত্তমান জীবনে প্রফুল্লতার অধিকারী হইতে পারে না। এই পাপ ও নাস্তিকতা ভিন্ন, ধর্ম্মাত্মার অন্তর হইতে অপর কিছুই প্রফুল্লতা দূর করিতে পারে না। বেদনা ও পীড়া, লজ্জা ও তিরস্কার, দারিদ্র্য ও বার্দ্ধক্য এমন কি মৃত্যুও তাহার নিকট অমঙ্গল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহারা অল্পকাল স্থায়ী; এবং ইহাদের হইতে ধর্ম্মাত্মা কোন না কোন উপকার প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধৈর্য্যের বলে সকল সময়ে প্রফুল্লতাকে রক্ষা করিতে পারেন।

যিনি বিবেকের আদেশ অনুসারে জীবন ধারণ করেন, তাঁহার অন্তরে প্রফুল্লতার দুইটি উৎস আছে। এক তাঁর আত্মজ্ঞান দ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত দয়ায় বিশ্বাস। এই দুয়ের সাহায্যে তিনি দেখিতে পান ঈশ্বর যখন তাঁর চিরস্থায়ী আত্মার এই প্রথম অবস্থায় তাঁহাকে এত সুখী করিলেন, তবে অনন্ত কালে তাঁর জন্য কত আনন্দই সঞ্চিত রাখিয়াছেন; "কে বা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা লোয়ে তাঁর অমৃতনিকেতনে'। তিনি দেখেন ঈশ্বরের দয়া ও শক্তি তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছে। নিরাশ তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। অজ্ঞ লোক যেমন ভয় ও বিপদে অভিভূত হয়, তিনি তেমন হন না।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।"

এই মহামন্ত্র তাঁহার জীবনের অবলম্বন। এই মন্ত্র জপ করিতে করিতেই তাঁহার জীবন কাটিয়া যায়। মৃত্যুকালে এই মহামন্ত্র জপিতে জপিতেই তিনি সেই চির আনন্দ স্বরূপে আত্ম সমর্পণ করেন। হায়! সে কি বিমলানন্দ! যে আনন্দের নিকট সংসারের সকল দুঃখ সকল তাপ মস্তক অবনত করে!।